আশাবরী

হুমায়ূন আহমেদ

"যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোন চিঠি পাই?
যদি সে নিজেই এসে থাকে
যদি তার এতকাল পরে মনে হয়
দেরি হোক, যায়নি সময়?"

জানেন, আমাদের বাসায় গত তিন মাস ধরে কোন আয়না নেই। ঠাট্টা করছি না। সত্যি নেই। একমাত্র আয়নাটা ছিল বাবার ঘরে। ড্রেসিং টেবিল নামের এক বস্তুর সঙ্গে লাগানো। একদিন সন্ধ্যায় বিনা নোটিশে সেই আয়না ঝুর ঝুর করে ভেঙ্গে পড়ে গেল। অভ্যাসের বশে আমরা এখনো ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়াই। যেখানে আয়না ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখতে চেষ্টা করি। ভুল ধরা পড়া মাত্র খানিকটা লজ্জা পাই। শুধু ভাইয়া এমন ভাব করে যেন সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে, আয়না থাকলে আমরা যে ভাবে মাথা এদিক ওদিক করে চুল আঁচড়াই সেও তাই করে।

মজার ব্যাপার কি জানেন, ঘরে যে আয়না নেই এ নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথাও নেই। আপা সব কিছু নিয়ে কঠিন গলায় কথা বলে, এ ব্যাপারে একটি কথাও বলছে না। ভাইয়াও চুপ। অথচ সংসারের দায়দায়িত্ব এখন অনেকখানি তাঁর। পুরুষ মানুষ বলতে সে একা। বাবার কোন খোঁজ নেই। কোথায় আছেন আমরা জানি না। তাঁকে নিয়ে আমরা তেমন চিন্তিতও নই। মাঝে মাঝে ডুব দেয়া পুরানো অভ্যাস। বাবার ব্যবসা যখন খারাপ চলে, সংসারে টাকা পয়সা দিতে পারেন না তখন উধাও হয়ে যান। মাসখানিক পর একটা পোস্টকার্ড এসে উপস্থিত হয়। পোস্টকার্ডের এক পিঠে সম্বোধনহীন চিঠি। যে চিঠিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হয় -- "পর সমাচার এই যে ব্যবসার কারণে আমাকে সুনামগঞ্জে আসিতে হইয়াছে। এক ঠগবাজের পাল্লায় পড়িয়া সামান্য অর্থনৈতিক ঝামেলায় পড়িয়াছি। তোমরা কোনমতে চালাইয়া নাও। যথা শীঘ্র চলিয়া আসিব। চিন্তার কোন কারণ নাই।"

যদিও লেখা থাকে সুনামগঞ্জ থেকে লিখছি কিংবা চাঁদপুর থেকে লিখছি তবু আমাদের সবার ধারণা তিনি লেখেন ঢাকায় বসেই কারণ পোস্টকার্ডে সুনামগঞ্জ কিংবা চাঁদপুরের কোন সীল থাকে না। একবার চিঠিতে লিখলেন যশোহর থেকে লিখছি। ওমা সেই চিঠি পরের দিন এসে উপস্থিত। ভাইয়া শার্লক হোমসের মত চিঠির ঠিকানা থেকে এই তথ্য বের করল এবং মাকে ক্ষেপাবার জন্য বলতে লাগল — সন্দেহজনক। খুবই সন্দেহজনক।

বাবা উধাও হলে টাকা পয়সার বড় রকমের সমস্যা হয়। তখন সংসার কি ভাবে চলে আমি জানি না। তবে আমাকে কলেজে যাবার সময় ঠিকই দশটাকা হাতখরচ দেয়া হয়।

টাকাটা নিতে লজ্জা লাগে তবু আমি আমার অভ্যাস মত বলি— আরো দশটা টাকা দাওনা মা প্লীজ। মা বিস্ময় এবং ব্যথিত চোখে তাকিয়ে থাকেন। হয়ত মনে মনে ভাবেন তাঁর এই মেয়েটা এত বোকা? কিছুই বুঝে না? আমি ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকি— দাও না মা প্লীজ। প্লীজ। দশ টাকাতো রিকশা ভাড়াতেই চলে যাবে। দুপুরে না খেয়ে থাকব?

এ রকম ঘ্যান ঘ্যান করা, সবকিছু বুঝেও না বোঝা আমার অভ্যাস। মানুষের অভ্যাস কি চট করে যায় আপনি বলুন? আয়না নেই জেনেওতো আমরা আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছি। দাঁড়াচ্ছি না সবই অভ্যাস। যেমন ভাইয়ার অভ্যাস হচ্ছে রসিকতা করা এবং দার্শনিক ধরনের কথাবার্তা বলা । তার যদি কোন কারণে ফাঁসি হয় আমার ধারণা সে ফাঁসির দড়ির কাছে গিয়ে চিন্তিত গলায় বলবে — দড়ি তো খুব পলকা মনে হচ্ছে — ছিড়ে পড়ে যাবেনা তো ভাই? আমার ওজন কিন্তু অনেক বেশী — একশ' পঞ্চাশ পাউণ্ড। রোগা পটকা চেহারা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না।

ভাইয়া তার রসিকতার অভ্যাস কিছুতেই বদলাতে পারবে না। আমার ধারণা তার মৃত্যুর সময়ও সে কোন না কোন রসিকতা করে আমাদেরতো হাসাবেই যে আজরাইল তার জীবন নিতে আসবে তাকেও হাসাবে। একবার কি হল শুনুন, ভাইয়ার প্রচণ্ড জ্বর। ঘরে থার্মোমিটার নেই কাজেই কত জ্বর তা বুঝতে পারছি না। আমি গ্রীণ ফার্মেসীর ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনলাম । তিনি জ্বর মেপে আঁতকে উঠলেন — একশ পাঁচ। এক্ষুণি শাওয়ারের নীচে বসিয়ে দিতে হবে, ক্রমাগত পানি ঢালতে হবে।

ভাইয়া আমাকে বলল, ও রেনু যাতো এক কেতলি পানি এনে আমার মাথার উপর বসিয়ে দে। পানি ফুটলে সেই পানিতে চা বানিয়ে আমাকে খাওয়া — মাছের তেলে মাছ ভাজা কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি। নিজের টেম্পারেচারে নিজের ফুড প্রিপারেশন ।

ভাইয়ার রসিকতায় আমরা সবাই হাসি। সবচে' বেশী হাসেন আমার বাবা। হাসতে হাসতে বলেন — "ফানি ম্যান। ভেরী ফানি ম্যান।"

শুধু আপা হাসে না। মুখ কঠিন করে বলে, "গোপাল ভাঁড়।" আপার ব্যাপার

আমি ঠিক বুঝি না — যেখানে খুশী হওয়া উচিত সেখানে সে বেজার হয়। রাগ করার কোনই কারণ নেই এমন সব জায়গায় সে রাগ করে।

আপা অসম্ভব রূপবতী। নিজের বোন না হয়ে অন্যের বোন হলে আমি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যেতাম। তাঁর চোখ সুন্দর, গায়ের রঙ সুন্দর, নাক মুখ সবই সুন্দর। না আমি মোটেই বাড়িয়ে বলছি না— একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবেন। আপা যখন ইডেন কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পরে তখনকার ঘটনা। সন্ধ্যা হয়েছে। আমরা সবাই বসে চা মুড়ি খাচ্ছি, বিরাট একটা গাড়ি এসে বাসার সামনে থামল। দু'জন অপরিচিত ভদ্রলোক এলেন। তাঁরা বাবার সঙ্গে কথা বলতে চান। শুনলাম তাঁরা সিনেমার লোক। নতুন ছবি বানাচ্ছেন — ছবির নাম "বোনের সংসার" । ছবিতে একজন টিন এজ নায়িকা থাকবে। দর্শকদের নতুন মুখ উপহার দেয়া হবে। মীরা আপা হচ্ছে সেই নতুন মুখ। এখন বাবা রাজি হলেই হয়। তাঁরা দশ হাজার টাকা সাইনিং মানি নিয়ে এসেছে।

বাবা বললেন, সাইনিং মানি ব্যাপারটা কি?

'ছবি করতে রাজি হলে চুক্তিপত্রে সই হবে, তখন টাকাটা দেয়া হবে। তারপর ছবি যত এগুবে তত ভাগে ভাগে টাকা দেয়া হবে। ফিল্ম লাইনে পুরোটা এক সঙ্গে দেয়ার নিয়ম নেই।'

বাবা খুব আগ্রহ নিয়ে বললেন, সব মিলিয়ে কত হবে?

'নতুনরা খুব বেশী পায় না তবে আমরা ভালই দিব পঞ্চাশ তো বটেই।'

'পঞ্চাশ কি?'

'পঞ্চাশ হাজার।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা হাজার। হাজারতো হবেই পঞ্চাশ টাকাতো দিতে পারেন না। হা–হা–হা। চা খাবেন স্যার?'

'জ্বি–না চা খাব না। আপনার মেয়েকে ডাকুন তার সঙ্গেও কথা হোক। আমাদের কি কথাবার্তা হচ্ছে তার শোনা দরকার।'

বাবা বললেন, ও আছে। এইখানে কি কথাবার্তা হয় সব বারান্দা থেকে শুনা যায়। একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

'স্যার আপনারা আমার মেয়ের খোঁজ পেলেন কোথায়?'

'তাঁর এক বান্ধবীর জন্মদিনে সে গিয়েছিল আমিও সেখানে ছিলাম। মনে ধরল, বেশ সুইট চেহারা। অবশ্যি হাইট কম। সেটা আমরা ক্যামেরায় ম্যানেজ করব ।'

'অভিনয় তো জানে না।'

'শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। সিনেমা হচ্ছে ডাইরেক্টরস মিডিয়া। ডাইরেক্টর ইচ্ছা করলে একটা কাঠের চেয়ারকেও নায়িকার রোল দিয়ে পার করে নিয়ে আসতে পারে ?'

'তাই না-কি ?'

'না মানে কথার কথা বলছি— আর কি। রূপক অর্থে বলা। ডাকুন আপনার মেয়েকে।'

বাবা দুঃখিত গলায় বললেন, ওকে ডাকাডাকি করে লাভ নেই ও করবেনা। বরং আমার ছোট মেয়েটাকে দেখতে পারেন — রেনু। চটপটে আছে। ডাকবাক্স না পোস্টবক্স নামে রবি ঠাকুরের একটা নাটক আছে না? ঐটাতে অভিনয় করেছিল। ভাল হয়েছিল। আমি অবশ্যি দেখিনি — শুনেছি। নানা কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকি সময় পাই না। টুকটাক বিজনেস করি। ছোট বিজনেসম্যান হল — ফকিরের মত। শুধু হাঁটাহাঁটি। স্যার ছোট মেয়েটাকে ডাকব?

'না আপনি বড় জনের সঙ্গেই কথা বলুন। সিনেমার কথা শুনলে রাজি হতেও পারে। টিন এজারদের এই দিকে খুব ঝোঁক।'

বাবা উঠে এলেন। আপা বাবাকে দেখেই পাথরের মত মুখ করে বলল- না।

বাবা ইতস্তত ঃ করে বললেন, ভদ্রলোক মানুষ, কষ্ট করে এসেছেন। টাকা পয়সাও নিয়ে এসেছেন। সেকেণ্ড থট দিবি না-কি?

'না।'

'সরাসরি না বলার কি দরকার? তুই গিয়ে বল আমি ভেবে দেখব। ভদ্রলোক কষ্ট করে এসেছেন।'

আপা আগের চেয়েও কঠিন স্বরে বলল, না।

বাবা নীচু গলায় বললেন, সিনেমা লাইনটা খারাপ না। ভাল ভাল মেয়েরা এখন যাচ্ছে। তা ছাড়া নিজে ভাল থাকলে জগৎ ভাল। নিজে মন্দ হলে জগৎ মন্দ। ভাল মন্দ নিজের কাছে। কি, ওদের চলে যেতে বলব?

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোকরা চলে গেলেন ঠিকই তারপরেও দু'বার এলেন। শেষবার এলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে। সব একশ টাকার নোট। বসার ঘরের বেতের টেবিলটা টাকায় প্রায় ভরে গেল। আমি আমার আঠারো বছরের জীবনে এত টাকা এক সঙ্গে দেখিনি। ভাইয়া বলল একশ টাকার নোটে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওজন কত জানিস? মাত্র এক পোয়া।

আমি বললাম, কেমন করে জানলে, তুমি ওজন করেছ?

'করেছি। একশ'টা একশ টাকার নোট ওজন করে সেখান থেকে বের করেছি। সহজ ঐকিক নিয়ম।'

ভাইয়ার এইসব কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে মিথ্যা কথা সত্যের মত করে বলে। সত্য কথাগুলি মিথ্যার মত বলে। আমরা সবাই তাতে খুব মজা পাই। বাবা হাসি মুখে বলেন, ফানি ম্যান, ভেরী ফানি ম্যান। শুধু আপা রাগ করে।

ভাইয়ার উপর আপার রাগ আরো বাড়ল যখন ভাইয়া তাকে ম্যাডাম ডাকা শুরু করল। সিনেমাতে নায়িকাদের না–কি ম্যাডাম ডাকার নিয়ম। ভাইয়া ম্যাডাম ডাকছে আর আপা রাগছে। রাগলে আপার ফর্সা মুখ লাল টকটকে হয়ে যায়। নাক ঘামতে থাকে। চোখের মনি হয়ে যায় স্থির। তখন আমি আপার দিকে তাকিয়ে ভাবি — ইস আমি কেন এত সুন্দর হলাম না। যদিও অভিনয় করার জন্যে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হত না। বিনা টাকাতেই আমি অভিনয় করে দিয়ে আসতাম। ইস আরেকটু যদি সুন্দর হতাম। দরিদ্র পরিবারে সুন্দরী হয়ে জন্মানো খুব সুখের নয়। আমি খুব ভাল করে জানি।

যেই দেখছে সেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠাচ্ছে। পিওন এক গাদা চিঠি রোজ দিয়ে যাচ্ছে। যার বেশীর ভাগই রেজিস্ট্রি। সেই সব চিঠির সবই প্রেমপত্র। খুব কাঁচা হাতে লেখা। ভুল বানান। লাইনে লাইনে কবিতা —। কিছু কিছু চিঠির কথাবার্তা অসম্ভব নোংরা। সেসব চিঠি হাত দিয়ে ছুলেও হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে আপা কোনদিনও একটি চিঠি পড়ে দেখেনি। মানুষের সাধারণ কৌতুহলওতো থাকে— কি লিখছে, জানার আগ্রহ। আপার নেই। সেইসব চিঠি পড়তাম আমরা দু'জন। আমি এবং ভাইয়া। চিঠিতে নাম্বার দেওয়া হত। কোনটা পাচ্ছে একশতে দশ, কোনটা একশতে পাঁচ। এর মধ্যে একটা চিঠি এল ইংরেজীতে। সম্বোধন হচ্ছে —

My dearest Moonshine

ভাইয়া পনেরো টাকা খরচ করে সেই চিঠি বাঁধিয়ে এনে আপার জন্মদিনে আপাকে প্রেজেন্ট করল। আপা খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা চোখে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইয়া তুমি যদি আর কোনদিন আমার সঙ্গে এ রকম রসিকতা কর তাহলে আমি কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

'কোথায় যাবি?'

'আমার যাবার জায়গার অভাব নেই — তুমি এটা ভালই জান। ঐ সিনেমা ওয়ালাদের কাছেও যেতে পারি। ওরা কার্ড দিয়ে গেছে।'

'সরি, আর করব না।'

আপা খাবার টেবিল থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল। জন্মদিন টন্মদিন তো আমাদের পরিবারে হয় না। হবার কথাও না। সেদিন মজা করবার জন্যেই ভাইয়া একটা কেক কিনে এনেছিল। কেকের উপরে লেখা –

"My dearest moonshine"

কোনই মজা হল না। শুধু বাবা ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, ফানি ম্যান। ভেরী ফানি ম্যান। মনে হল বাবাই খুব মজা পাচ্ছেন। কেকটাও বাবার খুব ভাল লাগল। পাঁচ পিস কেক খেয়ে ফেললেন। বারবার বিস্মিত গলায় বললেন — মারাত্মক টেস্ট হয়েছে তো! ভাইয়া বলল, মারাত্মক টেস্ট হবার কারণ জান তো বাবা? মারাত্মক পচা ডিম ব্যবহার করা হয়েছে। কেকের স্বাদ নির্ভর করে কি ধরনের পচা ডিম ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর।

আচ্ছা, আমার কথাবার্তা শুনে আপনার কি মনে হচ্ছে আমি আমাদের এই 'ফানি ম্যান'কে খুব পছন্দ করি? ঠিকই ধরেছেন। হ্যাঁ, আমি খুব পছন্দ করি। যদিও আমি কাউকেই খুব পছন্দ করতে পারি না, আবার কাউকে খুব অপছন্দও করতে পারি না। তবে . . . না থাক পরে বলব। এখন ভাইয়ার কথা বলি। ভাইয়াকে সবাই পছন্দ করে। এমন কি আমাদের বাড়িওয়ালাও। পৃথিবীর কোন বাড়িওয়ালাই ভাড়াটেদের পছন্দ করে না। যে ভাড়াটে নিয়মিত ভাড়া দেয় তাকেও না। কারণ বাড়িওয়ালার নিজের অতি আপন একটি জিনিস ভাড়াটে ব্যবহার করে। তাকে পছন্দ করার কোনই কারণ নেই। অথচ আমাদের বাড়িওয়ালা সুলায়মান সাহেব — ভাইয়াকে পছন্দ করেন। দু' মাস, তিন মাস বাড়ি ভাড়া বাকি থাকে — সুলায়মান সাহেব কিছুই বলেন না — অবশ্যি এক সময় ডেকে পাঠান। ভাইয়া বিস্ময়ের ভঙ্গি করে যায় এবং অবাক হওয়া গলায় বলে, কি জন্যে ডেকেছেন চাচা?

ভাইয়ার এই বিস্ময় দেখে সুলায়মান সাহেব হকচকিয়ে যান। আমতা আমতা করে বলেন, আছ কেমন?

'জ্বি ভাল। আপনি কেমন চাচা?'

'আছি কোনমত।'

'আপনার ডায়াবেটিস কি কিছু কমের দিকে?'

'ইনসুলিন নিচ্ছি না। ডায়েটের উপর আছি। করলা খাচ্ছি। মেথি খাচ্ছি,

হাঁটাহাঁটি করছি।'

'আপনাকে কিন্তু আগের চেয়ে অনেক ভাল দেখাচ্ছে।'

'না ভাল আর কোথায় শরীরে জোর পাই না।'

'শরীরের জোরটা আসল না চাচা, মনের জোরটাই আসল। মনে জোর রাখবেন — মনটাকে শক্ত রাখবেন। এই দেখুন না, টাকা পয়সার কি সমস্যা আমাদের যাচ্ছে। টিকে আছি মনের জোরে। আপনাকে তিন মাস ধরে বাড়ি ভাড়া দেয়া হচ্ছে না — লজ্জায় মরে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে যাতে দেখা না হয় এই জন্যে খুব সাবধানে থাকি। ঐদিন দেখি আপনি বাজার করে ফিরছেন। আমি সিগারেট কিনছিলাম, ধাঁই করে গলিতে ঢুকে পড়লাম। এই যে আপনি ডেকে পাঠালেন, আমি ভয়ে অস্থির যদি বাড়িভাড়া চান কি বলব?'

সুলায়মান সাহেব বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন — আরে না ঐ জন্যে তোমাকে ডাকি নি। এম্নি খবর দিয়েছি। অনেকদিন দেখা–সাক্ষাৎ হয় না। করছ কি আজকাল?'

'চারটা প্রাইভেট টিউশানি করছি। পত্রিকায় একটা কাজ জোগাড় করেছি — বিভিন্ন প্রতিবেদন টেদন লিখি। ছাপা হলে শখানিক দেয়।'

'কি পত্রিকা?'

'ফালতু পত্রিকা। নাম হচ্ছে শতদল — এই পত্রিকার একমাত্র আকর্ষণ হল ধর্ষণের খবর। যে সপ্তাহে কোন মেয়ে রেপড হয় না সেই সপ্তাহে আমাদের পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদকের খুব মন খারাপ থাকে।'

'কি বলছ এসব?

'আমি দু'একটা সংখ্যা দিয়ে যাব, পড়লেই বুঝবেন। ধর্ষণের এত সুন্দর বর্ণনা আপনি কোন পত্রিকায় পাবেন না। আমরা কোন ডিটেইল বাদ দেই না।'

'বল কি? হচ্ছে কি দেশটার? খুবই চিন্তার কথা।'

'চাচা আজ তাহলে উঠি। আমার আবার একটা ইন্টারভ্যু নিতে হবে। রেপড হয়েছে এমন একটা মেয়ে।'

শুনলে সবার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে — আমরা পাঁচ বছর এ বাড়িতে আছি — বাড়ির ভাড়া বাড়ে নি। কেন বাড়েনি জানেন? ভাইয়ার জন্য। একবার চারশ' টাকা ভাড়া বাড়ল। সুলায়মান সাহেব নিজে এসে বাবাকে এই খবর দিয়ে গেলেন। হাত টাত কচলে বললেন, কি করব ভাই বলুন — প্রপার্টি ট্যাক্স ডাবল করে দিয়েছে। প্রপার্টি বলতে তো এই বাড়ি। ভাড়ার উপর বেঁচে আছি। মেয়েগুলিকে বিয়ে দিয়েছি — একা মানুষ বলে কোন রকমে চলে যায়। এমন সমস্যা কি আর

বলব আপনাকে — জামাইরা প্রতি মাসে টাকার জন্য আসে। ফকিরেরও অধম। ভাড়া না বাড়িয়ে তো পারছি না। চারশ' টাকা করে বেশী দিতে হবে সামনের মাস থেকে। তিন ঘর ভাড়াটের সবার ভাড়াই চারশ' করে বাড়িয়েছি।

বাবা বললেন — আচ্ছা ঠিক আছে।

সব কিছুতেই রাজি হয়ে যাওয়া বাবার স্বভাব। তিনি এমন ভাব করলেন যে চারশ' টাকা কিছুই না। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আমাদের। চারশ' টাকা বাড়তি দেয়া একেবারেই অসম্ভব। ভাইয়া বলল, কোন চিন্তা নেই, আমি ঠিক করে দেব।

সন্ধ্যাবেলা সে গেল। মুখ কাঁচু মাচু করে বলল, চাচা আপনি না-কি আমাদের বের করে দিচ্ছেন?

সুলায়মান সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন — সেকি। তোমাদের বের করব কেন? ছিঃ ছিঃ — কার কাছে শুনেছ এসব কথা?

'বাড়িভাড়া চারশ' বাড়িয়েছেন — আমাদের বের হয়ে না যাওয়া ছাড়া উপায় কি? কোত্থেকে দেব বাড়তি চারশ' টাকা? যা ভাড়া তাই দিতে পারি না। দু'দিন পরে পরে বাকি পড়ে।'

সুলায়মান সাহেব বিব্রত গলায় বললেন – আচ্ছা আচ্ছা থাক। বাদ দাও। যা আছে তাই। অন্য ভাড়াটেদের কিছু জানিও না।

ভাইয়া দরাজ গলায় বলল, 'আমার একটা চাকরি বাকরি হোক। তারপর দেখবেন, আপনাকে বলতে হবে না। পাঁচশ' টাকা বাড়তি আপনার হাতে গুনে দিয়ে যাব।

সুলায়মান সাহেব বললেন আচ্ছা আচ্ছা - ঠিক আছে। একবার তো বললাম ঠিক আছে।

'আপনার ব্যবহারে মনে খুব কষ্ট পেয়েছি চাচা।'

'আহা বাদ দাও না। চা খাও। কই নসু — বাবা আমাদের দু'জনকে চা দাও তো।'

সুলায়মান সাহেব ভাইয়াকে কেন এত পছন্দ করেন আমি জানি না। এত বাড়াবাড়ি ধরনের পছন্দ দেখা যায় না বলে ব্যাপারটাকে অনেকদিন আমরা সন্দেহের চোখে দেখতাম। আমাদের ধারণা ছিল -- সুলায়মান সাহেবের কোন আত্মীয়ার সঙ্গে তিনি ভাইয়ার বিয়ে দিতে চান। সেই আত্মীয়ার এমনিতে বিয়ে হবার সম্ভাবনা নেই। হয়ত এসিডে পুড়ে মুখ ঝলসে গেছে কিংবা পঙ্গু। আমাদের সব ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে সুলায়মান সাহেবের ভাল লাগার পেছনে তেমন কোন স্বার্থ

নেই। এটাও খুব অস্বস্তিকর। স্বার্থ ছাড়া ভালবাসে এমন মানুষ আমরা দেখি না। হঠাৎ কাউকে দেখলে খানিকটা অস্বস্তি লেগেই থাকে।

একটা লোক যে তাকে এত পছন্দ করে তা নিয়ে ভাইয়ার কোন মাথাব্যথা নেই। যেন সে ধরেই নিয়েছে সবাই তাকে পছন্দ করবে।

মজার ব্যাপার — করছেও তাই। আমাদের পেছনেই থাকেন ব্যারিস্টার মুশফেকুর রহমান। তিনি তাঁর দোতলা বাড়ি এত বড় করে বানিয়েছেন যে আমরা শীতের সময় ভোরের রোদ পাই না। অসম্ভব ব্যস্ত এই মুশফেকুর রহমান সাহেবের সঙ্গেও ভাইয়ার খাতির আছে। এই খাতির কি ভাবে হল আমরা জানি না। ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করলে সে হাসে। প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রাত ন'টার দিকে মুশফেকুর রহমান সাহেব লোক পাঠিয়ে দেন — ভাইয়াকে তাঁর প্রয়োজন। একহাত দাবা খেলবেন। ভাইয়া দাবা খেলতে যায় — রাত এগারোটা বারটার দিকে ফিরে। তার মুখে হাসি।

'কি ভাইয়া হারলে না জিতলে?'

'প্রথম দিকে উইন করছিলাম। একটা পণ এবং দু'টা পিস আপ ছিল। শেষটায় গুবলেট করে দিয়েছি।'

'প্রতিবারই তো শুনি একই ব্যাপার।'

'ব্যারিস্টার সাহেব শুরুতে খুব খারাপ খেললেও শেষের দিকে সামলে খেলেন। একেকটা দুর্দান্ত চাল দিয়ে — ছেড়াবেড়া করে দেন।'

ব্যারিস্টার সাহেবের সবচে' ছোট মেয়ে দুলু আপাও যে আমাদের মত গরীব মানুষদের বাসায় আসা যাওয়া করে আমার ধারণা তার একমাত্র কারণ ভাইয়া।

দুলু আপা তাদের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে গল্প করেন। তখনি করেন যখন ভাইয়া উঠানে থাকে। আমি মনে মনে হাসি। প্রকাশ্যেই হাসতাম — তা হাসি না কারণ দুলু আপাকে আমি খুব পছন্দ করি।

চমৎকার মেয়ে। হিস্ট্রিতে অনার্স ফাইনাল দেবেন। খুব ভাল ছাত্রী। দিনরাত হাতে বই। চাপা ধরনের মেয়ে। একটু পাগলাটে ভাব আছে। হয়ত ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে আমি কলেজে না গিয়ে বাসায় বসে আছি। দুলু আপাদের বাসার কাজের লোক আমার জন্যে চিঠি নিয়ে এল। চিঠিতে লেখা — 'রেনু, খুব বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজবে? যদি রাজি থাক — চলে আস। আমরা গাড়ি করে গ্রামের দিকে চলে যাব। তারপর রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে বৃষ্টিতে ভিজব।'

একদিন কথামত গেলাম। গাড়ি জয়দেবপুর ছাড়িয়ে চলে গেল। মোটামুটি

নির্জন একটা জায়গা বের করে দুলু আপা বললেন, ড্রাইভার সাহেব থামেন তো। ড্রাইভার গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে বসে রইল — আমরা বৃষ্টিতে ভিজে এলাম। দুলু আপা কয়েকবার বলল, ইন্টারেস্টিং লাগছে, না রেনু?

আমার মোটেই ইন্টারেস্টিং লাগছিল না — তবু বললাম, দারুন লাগছে।

দুলু আপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, পুরোপুরি নগ্ন হয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে পারলে আরো চমৎকার হতো — তাতো আর সম্ভব না।

যে মেয়ে এ জাতীয় কথা বলে তার মাথায় ছিট আছে তাতো বলাই বাহুল্য।

দুলু আপার মত ভাবুক, অসম্ভব রোমান্টিক, আবেগ-তাড়িত একটি মেয়ে ভাইয়ার মত মানুষের জন্য দুর্বলতা পোষণ করা স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলে এতটা কি উচিত? তাও যদি ভাইয়ার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হত। চোখের দেখাতে প্রেম গল্প উপন্যাসে হয়। বাস্তবে প্রেমে পড়ার জন্যে একজনকে অন্যজনের কাছাকাছি যেতে হয়। ভাইয়া এবং দুলু আপা, দু'জন দু'প্রান্তের মানুষ।

ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হলে ভাইয়া তার স্বভাবমত রসিকতা অবশ্য করে। কিন্তু দুলু আপাকে দেখে বোঝার কোন উপায়ই নেই — তিনি এই রসিকতাগুলি পছন্দ করছেন কি করছেন না। হয়ত দুলু আপা ভোরবেলায় আমাদের বাসায় এসেছেন। ভাইয়া মেঝেতে বসে দাড়ি কামাচ্ছে। যেহেতু আয়না নেই দাড়ি কাটতে হচ্ছে সম্পূর্ণ অনুমানের উপর। দুলু আপাকে দেখে ভাইয়া খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল–

'তারপর দুলু, খবর ভাল?'

'জ্বি ভাল।'

'হিস্ট্রি পড়ছ কেমন? ভাজা ভাজা করে ফেলছ নাকি?'

'ভালই পড়ছি।'

'আচ্ছা বল তো দেখি সম্রাট শাহ্‌জাহানের খালা শাশুড়ির নাম কি? দশটাকা বাজি। তুমি বলতে পারবে না।'

দুলু আপা তার উত্তরে কিছু বলবে না — পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকবে। তাকে দেখে তখন মনে হওয়া অস্বাভাবিক না যে দাড়ি কামানোর দৃশ্যই হচ্ছে পৃথিবীর সবচে' সুন্দর দৃশ্য।

ভাইয়া নিরাসক্ত ধরনের মানুষ। কোন কিছুতেই তার আসক্তি নেই। যখন পয়সা হচ্ছে — ধুমসে সিগারেট টানছে। টাকা পয়সা শেষ — নির্বিকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখে মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় — সে চোখবন্ধ একজন মানুষ। তাকিয়ে আছে কিন্তু তেমন কিছু দেখছে না। যদি দেখত তাহলে অবশ্যই

বুঝতে পারত দুলু আপা গভীর আগ্রহে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। যে আগ্রহে তিল পরিমাণ খাদ নেই।

ভাইয়া যখন ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে দাবা খেলেন, দুলু আপা তখন বসার ঘরে পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেই দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা অদ্ভুত। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে থাকে। থর থর করে কাঁপতে থাকেন। আমি একদিন দৃশ্যটা দেখে ফেললাম। অবাক হয়ে বললাম, কি হয়েছে আপা?

দুলু আপা বিব্রত গলায় বললেন, কিছু হয়নি তো।

'এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

দুলু আপা ফিস ফিস করে বলল, এম্নি। এম্নি দাঁড়িয়ে আছি। বলতে বলতে তার চোখ ভিজে উঠল। গলা ধরে গেল।

ভাইয়ার যেবার একশ পাঁচ জ্বর হল তখন কি পরিমাণ অস্থিরতা যে দুলু আপার দেখেছিলাম তা কখনো গুছিয়ে বলতে পারব না। মানুষ খুব অস্থির হলে নানা ভাবে সেই অস্থিরতা প্রকাশ করে। কাঁদে, হৈ চৈ করে। দুলু আপা অস্থিরতা প্রকাশ করতে পারেন না। নিজের মধ্যে চেপে রাখেন। তার কষ্টও সীমাহীন। জ্বর নামানোর জন্যে যখন আমরা ধরাধরি করে ভাইয়াকে বাথরুমে নিয়ে যাচ্ছি — শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে জ্বর নামাবো। তখন দুলু আপা আমাদের ঘরে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হল, ভাইয়াকে ধরে নিয়ে যাবার কাজটির বিনিময়ে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন এক কথায় দিয়ে দিতে পারেন। ভাইয়া দুলু আপার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি খবর দুলু? ভাল? অসময়ে কি মনে করে?

দুলু আপা হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, আজকের খবরের কাগজটা নিতে এসেছি।

ভাইয়া বলল, ভুল জায়গায় এসেছ আমরা খবরের কাগজ রাখি না। একটা কাগজের দাম তিন টাকা। ত্রিশ গুনন তিন, মাসে নব্বুই টাকা — ফর নাথিং চলে যায়। নব্বুই টাকায় ছ' সের চাল হয়।

দুলু আপার সঙ্গে কখনো ভাইয়া এই ভঙ্গিতে কথা বলে না। সেবার বলল তার কারণ জ্বর তার মাথায় উঠে গেছে। সে কি বলছে নিজেও জানে না।

আমরা ভাইয়াকে বাথরুমে ঢুকিয়ে কল ছেড়ে দিলাম। দুলু আপা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন। পুরোপুরি গেলেন না, তাদের দোতালার বারান্দার এক কোণায় দাঁড়িয়ে রইলেন, যেখান থেকে আমাদের ঘরের অনেকটা দেখা যায়।

ভাইয়ার জ্বর নামতে নামতে দু'টা বেজে গেল। তখনো দুলু আপা দাঁড়িয়ে।

আমি উঠোনে গিয়ে বললাম, আপা ভাইয়ার জ্বর নেমে গেছে।

দুলু আপা যেন আমার কথা শুনতে পাননি এমন ভঙ্গিতে বললেন, রেনু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোছনা দেখছিলাম। কি সুন্দর জোছনা হয়েছে দেখেছিস? দুলু আপার ভাবটা এমন যেন সারাক্ষণ তিনি জোছনা দেখার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাইয়ার জ্বর কমল কি না কমল সে ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ নেই।

কি কথা থেকে, কি কথায় চলে এসেছি — শুরুতে কি বলছিলাম যেন? ও আচ্ছা — আয়না। হ্যাঁ আমাদের বাসায় কোন আয়না নেই। তিন মাস ধরেই নেই। এবং এই নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথাও নেই। ভাইয়া বরং একটু খুশী। আমাকে বলল, আয়না না থাকার একটা বড় সুবিধা কি জানিস? রোজ নিজেকে দেখতে হয় না। মানুষ নিজেকে যেমন ভালবাসে নিজেকে তেমন ঘৃণাও করে। ঘৃণার মানুষটাকে রোজ দেখতে হচ্ছে না এটা আনন্দের ব্যাপার না?

আয়না না থাকার কষ্ট মীরা আপার সবচে' বেশী হওয়ার কথা। সুন্দরীরা বার বার নিজেকে দেখতে চায়। রূপকথার রাজকন্যাদের মত আয়নার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে — বল তো সুন্দরী কে আমার চেয়ে? কিন্তু আপাকেও নির্বিকার মনে হচ্ছে। একদিন সে শুধু নীচু গলায় বলল, আমার নিজের চেহারাটা কেমন আমি ভুলে গেছি। সত্যি ভুলে গেছি। মজার ব্যাপার কি জানিস ভুলে গিয়ে ভালই লাগছে।

ঠিক দু'মাস এগারো দিন পর, আমাদের বাসায় নতুন আয়না এল। বাবা কাঠের ফ্রেমের বেশ বড় সড় একটা আয়না নিয়ে অনেকদিন পর উদয় হলেন এবং হাসিমুখে বললেন — খবর সব ভাল?

সেই আয়না বারান্দায় টানানো হল। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখি দু'টা মুখ দেখা যাচ্ছে।

বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, এরকম হচ্ছে কেন? আমি তো দেখে শুনেই কিনলাম। বদলানোর তো কোন উপায় নেই, বদলাতে হলে চিটাগাং যেতে হয়। চিটাগাং থেকে কেনা।

ভাইয়া বলল, বদলানোর দরকার কি? একটার জায়গায় দু'টা মুখ দেখা যাচ্ছে। ভালই তো। একের ভেতর দুই। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল — একটা মুখকে হাসিখুশী দেখায় অন্যটা গম্ভীর। জ্যাকেল এণ্ড হাইড।

বাবা হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, ফানি ম্যান। ভেরি ফানি ম্যান।

২

বাবা এবার খুব হাসি খুশী হয়ে ফিরেছেন। সব বার এরকম হয় না। যতবার বাইরে থেকে আসেন তাঁকে ক্লান্ত লাগে, মনে হয় খানিকটা বয়স যেন বেড়েছে। মাথার কয়েকটা চুল বেশী পাকা। চোখের নীচটা যেন আগের চেয়েও সামান্য বেশী ঝুলেছে। এবার ব্যতিক্রম হল। বাবার মাথার সব চুল কুচকুচে কাল। পান খাওয়ার কারণে দাঁতে যে লাল ছোপ ছিল তাও নেই। ঝকঝকে সাদা দাঁত। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন হিসেবে চালিয়ে দেবার মত দাঁত।

ভাইয়া বলল, চুলে কলপ দিয়েছ না-কি?

বাবা খানিকটা লজ্জা পেলেন। লজ্জা ঢাকার তেমন চেষ্টা করলেন না। লাজুক গলাতে বললেন, চুল কাটতে গিয়েছি। কাটা শেষ হলে নাপিত বলল, ওয়াশ করে দেব না-কি স্যার? আমি বললাম, দাও। খানিকক্ষণ পরে দেখি এই অবস্থা। ওয়াশ মানে যে কলপ তাতো জানতাম না।

ভাইয়া বলল, দাঁতের এই অবস্থা করলে কি করে ? দাঁতও ওয়াশ করেছ?

'আরে না। ডেনটিস্টের কাছে গিয়েছিলাম দাঁত তুলতে। সে ক্লীন করে দিল।'

ভাইয়া বলল, তুমি তোমার বয়স দশ বছর কমিয়ে নিয়ে এসেছ? একটা রঙচঙা হাফসার্ট পরলে তোমার বয়স পনেরো বছর কম মনে হবে। দেব একটা সার্ট?

কি কাণ্ড, গোসল করে বাবা সত্যি সত্যি রঙ্গিন সার্ট পরলেন। তার নিজের না, ভাইয়ার। লাল নীল ফুল আঁকা বাহারী সার্ট। মাপে খানিকটা বড় হল। কারণ ভাইয়া হচ্ছে প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি। তাতে অসুবিধা হল না। বাবাকে সার্টে খুব মানিয়ে গেল। তাঁকে যুবক ছেলের মতই দেখাতে লাগল। তিনি বারান্দায় মোড়ায় বসে পা নাচাতে নাচাতে সিগারেট টানতে লাগলেন। যেন তিনি পৃথিবীর সবচে' সুখী মানুষ। গাঢ় গলায় বললেন, কই চা দাও তো, আরাম করে এককাপ চা খাই।

মা চা নিয়ে বের হলেন। আমরা দ্বিতীয়বার চমকালাম। মা'র পরণে নতুন শাড়ি। এই শাড়ি বাবা নিয়ে এসেছেন। বাবা সম্ভবত কালার ব্লাইণ্ড। কালার ব্লাইণ্ড না হলে

এমন ভয়াবহ রঙের শাড়ি কেনা সম্ভব না। মালটি কালার শাড়িতে মাকেও খুকী খুকী লাগছে। খুকী খুকী লাগার প্রধান কারণ মা কানে দুল পরেছেন। চুল টান টান করে বেণী করেছেন। এমন সাজগোজ করে মা লজ্জায় মরে যাচ্ছেন। কোনমতে বাবার সামনে চায়ের কাপ রেখে রান্নাঘরে পালিয়ে বাঁচলেন। মা'র সঙ্গে আমরা ঠাট্টা তামাশা বিশেষ করি না। কারণ তিনি রসিকতা বুঝতে পারেন না। কেঁদে ফেলেন। ভাইয়া যদি ঠাট্টা করে বলতো, ব্যাপার কি মা? আজ কি তোমার বিয়ে? তাহলে মা নিশ্চয়ই চায়ের কাপ ছুড়ে ফেলে চিৎকার করে কেঁদে একটা কাণ্ড ঘটাতেন।

বাবা কিছুদিন বাইরে থেকে ফিরলে মা খানিকটা সাজসজ্জা করেন। কিছুটা নিজের ইচ্ছায় তবে বেশীরভাগই বাবার অনুরোধে। শাড়ি না পাল্টানো পর্যন্ত বাবা ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকবেন —

এতদিন পর আসলাম, তুমি ফকিরণী সেজে আছ ব্যাপারটা কি? শাড়িটা পাল্টাও তো। চুল টুল বাঁধো। একদিন রান্না না করলে কিছু যায় আসে না। না হয় হোটেল থেকে কিছু এনে খেয়ে নিলেই হবে। খাওয়াটা জরুরী না।

মা'কে বাধ্য হয়ে সাজ করতে হয়।

তেমন কিছু না— চুল বাঁধেন। চোখে কাজল দেন এবং তাঁর একমাত্র গয়না কানের দুল জোড়া পরে ছেলে মেয়েদের সামনে লজ্জা সংকোচে এতটুকু হয়ে যান। আমরা এমন ভাব করি যে ব্যাপারটা কেউ লক্ষ্যই করছি না। কোন একটা ঠাট্টা করার জন্য ভাইয়ার জিব চুলকাতে থাকে। আমি চোখে চোখে ইশারা করি — যেন ঠাট্টা না করে।

বাবা অনেকদিন পর আসায় আমাদের দিনটা সুন্দরভাবে শুরু হল। আপা বলল, সে ইউনিভার্সিটিতে যাবে না। আপা যেখানে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না, আমার সেখানে কলেজে যাবার প্রশ্নই উঠে না। ভাইয়া যে ভাবে বাবার সামনে পা ছড়িয়ে বসেছে তাতে মনে হয় সেও কোথাও যাবে না।

বাবা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, তোর মা'কে আজ তো দারুণ লাগছে। লক্ষ্য করেছিস? মনে হয় ষোল সতেরো বছরের খুকী! ঠিক না?

ভাইয়া বলল, খুব ঠিক।

বাবা বললেন, একটা ছবি তুলে রাখলে ভাল হত। আজ আবার আমাদের একটা বিশেষ দিন। বিশেষ দিন কেন সেটা আবার জানতে চাস না যেন। সব কিছু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ডিসকাস করা যায় না। আমি মানুষটা ওল্ড ফ্যাশান্ড।

ভাইয়া বলল, আমাকে হিন্টস দাও। বাকিটা আমরা আন্দাজে বুঝে নেব। আজ যে তোমাদের বিয়ের দিন না তা জানি — তোমাদের বিয়ে হয়েছে আগস্ট মাসে, এটা হল জুন। এই দিনে তোমরা কি করেছিলে?

বাবা চোখ বন্ধ করে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। ভাবটা এমন যেন প্রশ্নটা শুনতে পান নি।

বাবা এবং মা'র অনেকগুলি বিশেষ দিন আছে। এই সব দিনগুলি তাঁরা মনে রাখেন। একটাও ভুলেন না। এবং তাঁদের মত করে দিনগুলি পালনও করা হয়। কয়েকটা বিশেষ দিন আমরা জানি যেমন মে মাসের দু' তারিখ — তাঁদের প্রথম দেখা। আগষ্ট মাসের আট তারিখ বাবার সঙ্গে পালিয়ে ঢাকায় চলে আসা। নানান ধরনের নাটকীয় কাণ্ড এই দু'জন করেছেন। বাবার পক্ষে সবই সম্ভব কিন্তু মা'র মত শান্ত, সরল এবং খানিকটা বোকা বোকা ধরনের মহিলার পক্ষে কি করে সম্ভব তা কখনো ভেবে পাই না। মা যে কাণ্ড করেছেন, আমি বা আপা কখনো এসব করতে পারব বলে মনে হয় না।

একটা ছেলে যার সঙ্গে কোন কথা হয় নি শুধু দূর থেকে চোখে চোখে দেখা — সে এক সন্ধ্যায় কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি আমার সঙ্গে চল। যদি না যাও রেল লাইনে শুয়ে পড়ব। ওম্নি মা, যার বয়স মাত্র পনেরো, তিনি বাড়ির কাউকে একটা কথা না বলে বের হয়ে গেলেন। এটা কি করে সম্ভব হল, কে বলবে? আমি মা'কে একবার খুব শক্ত করে ধরলাম — একটা ছেলেকে তুমি চেন না জান না। তোমাদের মধ্যে কোন কথাও হয় নি। সে এসে বলল, আর তুমি ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলে। কেন এটা করলে বল তো?

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, বাদ দে তো —। দু'দিন পর পর এক কথা। বাদ দে।

'না বাদ দেব না। বলতে হবে।'

মা ভেজা ভেজা গলায় বলল, ঐ সন্ধ্যায় তোর বাবার সঙ্গে না বের হলে তো সে রেল লাইনে শুয়ে পড়ত। সেটা ভাল হত?

'সে রেল লাইনে শুয়ে পড়ত তা 'কি করে বুঝলে?'

'বুঝা যায়। আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বলল।'

'ছেলেরা বানিয়ে বানিয়ে এ জাতীয় কথা অনেক বলে।'

'তোদের সময় বলে। আমাদের সময় বলতো না।'

'না বলতো না — তোমাদের সময় তো ছেলেরা মহাপুরুষ ছিল? সদা সত্য কথা কহিত।'

'চুপ কর তো।'

'তুমি খুব বোকা ছিলে মা। খুবই বোকা। বাবা না হয়ে অন্য কোন ছেলে হলে তোমার কি যে হত কে জানে।'

'যথেষ্ট হয়েছে, চুপ কর।'

বাবাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, খুব সিরিয়াস গলায় বলেছিলাম, আচ্ছা বাবা, মা যদি ঐ দিন তোমার সঙ্গে না যেত তুমি কি সত্যি সত্যি রেল লাইনে শুয়ে পড়তে?

বাবা গলা নীচু করে বলেছিলেন, পাগল হয়েছিস? ঐদিন কথার কথা হিসেবে বলেছিলাম। তোর মা যে বের হয়ে চলে আসবে কে জানত। যখন সত্যি সত্যি বের হয়ে এল — মাথায় সপ্ত আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এমন ভরা বয়সের মেয়েকে নিয়ে যাই কোথায়? পকেটে নাই পয়সা। স্টেশনে গিয়ে বসে আছি — তোর মা ক্রমাগত কাঁদছে। একবার ভয়ে ভয়ে বললাম — বাড়িতে ফিরে যাবে? তোর মা কাঁদতে কাঁদতে বলল — না। আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ্ পাক, তুমি আমাকে একি বিপদে ফেললে। ইউনুস নবী মাছের পেটে বসে যে দোয়া পড়েছিলেন — ক্রমাগত সেই দোয়া পড়ছি — লাইলা-হা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জুয়ালেমিন।

'দোয়ায় কাজ হল?'

'খানিকটা হল। ট্রেনে উঠার পর তোর মা'র কান্না থেমে গেল।'

'হাসি শুরু করলেন?'

'না। গল্প শুরু করল। দুনিয়ার গল্প। এত গল্প যে তার পেটে ছিল কে জানত? আমার কান ঝালাপালা করে দিল। মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি তখন সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগায়। বিরাট যন্ত্রণা। তার উপর আখাউড়া স্টেশনে টিকিট চেকার এসে টিকিট চাইল। সাড়ে সর্বনাশ। টিকিট কাটি নি।

'কাটনি কেন?'

'পয়সা কোথায় টিকিট কাটব?'

'তখন কি করলে?'

'এই সব শুনে লাভ নেই। বাদ দে।'

'বাদ দেব কেন বলনা শুনি।'

'তোর মা টাকা দিল। ফাইন দিয়ে টিকিট কাটলাম। আজকাল যেমন বিনা ভাড়ায় চলে যাওয়া যায় কেউ কিছু বলে না। আমাদের সময় খুব কড়াকড়ি ছিল।'

'মা কি ভাবে টাকা দিল? তার কাছে টাকা ছিল?'

'হুঁ ছিল। মেয়েরা খুব হুঁসিয়ার। কোন মেয়ে ঝোঁকের মাথায় কিছু করে না, তোর মা তার বাবার ব্যাগ থেকে নগদ তিনশ' টাকা নিয়ে এসেছিল। তখনকার তিনশ' মানে মেলা টাকা। আমরা দুই মাস এই টাকার উপর বেঁচে ছিলাম।'

'বাবা, তোমাদের জীবনের শুরুটা খুব সুন্দর ছিল। ছিল না?'

প্রশ্নটা করেই মনে হল ভুল করেছি। এই প্রশ্ন করা উচিত হয় নি। বাবার হাসি হাসি মুখ করুণ হয়ে গেছে। তিনি তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে। কারণ তাঁদের জীবনের শুরুটা খুব সুন্দর ছিল না। তাঁরা কঠিন দুঃসময় পার করেছেন। আমার নানাজান বাবার বিরুদ্ধে কেইস করে দিয়েছিলেন। ফুসলিয়ে নাবালিকা অপহরণের মামলা। পুলিশ চারমাস পর বাবাকে ধরে হাজতে পাঠিয়ে দেয়। মাকে পাঠানো হয় নানাজানের কাছে। মা তখন অন্তসত্ত্বা। সব জানার পর নানাজান কেইস তুলে নিলেন তবে বাবাকে গ্রহণ করলেন না। মা পুরোপুরি বন্দি হয়ে গেলেন। তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম হল — আমাদের সবচে' বড় বোন — নাম 'অরু'। বাবা তাঁর প্রথম সন্তানের মুখ কোনদিন দেখতে পেলেন না। জন্মের পর পরই আমাদের বড় আপার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে কোন রহস্য কি ছিল? হয়ত ছিল। আমরা জানি না। জানতেও চাই না।

বৎসরের একটা দিনে মা দরজা বন্ধ করে সারাদিন কাঁদেন। বাবা শুকনো মুখে দরজার বাইরে মোড়ায় বসে থাকেন। আমরা জানি এই দিনটি হচ্ছে — বড় আপার মৃত্যু দিন। যে বড় আপার বয়স মাত্র একদিন — কিন্তু একদিন বয়স হলেও সে আমাদের সবার বড়। সে বেঁচে থাকলে আজ আমরা চার ভাইবোন বাবাকে ঘিরে বসে থাকতাম। সে থাকতো বাবার সবচে' কাছাকাছি। বড় মেয়েরা তো সব সময়ই বাবার কাছের জন হয়। তা ছাড়া সে আমাদের বাবা-মা'র ভালবাসাবাসির প্রথম ফুল।

বাবা চা শেষ করে খুশী খুশী স্বরে বললেন, এককাপ চায়ে তো তেমন জুত হল না। সেকেণ্ড কাপ অব টি হবে না-কি? তোরা কেউ গিয়ে আরেক কাপ আন। তোর মা রান্নাঘরে বসে আছে কেন? আজ একটা বিশেষ দিন।

আপা বলল, বিশেষ দিনটা কি বলে ফেল না।

বাবা বললেন, অতিরিক্ত কৌতূহল ভাল না। বিশেষ করে বাবা-মা'র পার্সোন্যাল লাইফ সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের কোন রকম কৌতূহল থাকা উচিত না। যা হোক

এইবার শুধু বলছি — আর কিছু জানতে চাইবি না। চাইলেও লাভ হবে না। বলব না। আজকের দিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ . . . বাবা কথা শেষ করতে পারলেন না। মা রাগী মুখে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে বললেন — চুপ করবে?

'আহা শখ করে শুনতে চাচ্ছে।'

'তুমি যদি মুখ খোল আমি কিন্তু গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেব।'

'থাক তাহলে। বাদ দিলাম।'

আপা বলল, তোমরা দু'জন কোনখান থেকে ঘুরে আস না কেন? বাইরে কোন রেস্টুরেন্টে খাও। এখানের রান্নাবান্না আমি করব।

বাবা বললেন, আইডিয়া খারাপ না। মিনু যাবে?

মা বললেন, মরে গেলেও না।

মা'র কথা এবং কাজ এক হল না। কিছুক্ষণের ভেতর মা'কে দেখা গেল লজ্জা লজ্জা মুখে বের হচ্ছেন। বাবার গায়ে ভাইয়ার রঙিন সার্ট। সার্টটাকে এখন আরো বড় লাগছে। বাবাকে খুবই হাস্যকর দেখাচ্ছে। লম্বা সার্ট পরলে বেঁটে মানুষকে যে আরো বেঁটে লাগে তা আমার জানা ছিল না।

বাবা বেশ কিছু টাকা পয়সা নিয়ে এসেছেন। এও এক রহস্য। তাঁর ব্যবসা এমনই যে কখনো হাতে কিছু থাকে না। বাড়িভাড়া দেয়া হয় তো দোকানে বাকি থাকে। যেবার দোকান ক্লিয়ার করা হয় সেবার বাইরের কারোর কাছে ধার হয়।

এবার সব ধার মিটিয়ে দেয়া হল। তিন মাসের বাড়িভাড়া নিয়ে আমি দোতলায় উঠে গেলাম। সুলায়মান চাচা বসার ঘরে টিভির সামনে বসে ছিলেন। আমাকে দেখে শুকনো গলায় বললেন, কী খবর?

আমি বললাম, বাড়িভাড়া দিতে এসেছি চাচা।

' ক' মাসের?'

'তিন মাসের।'

'টেবিলের উপর রেখে দাও।'

কেমন শুকনো গলা। যেন আমাকে চেনেন না। কিংবা চেনেন কিন্তু পছন্দ করেন না। এরকম হবার কথা নয়। সুলায়মান চাচা ভাইয়ার মত আমাকেও পছন্দ করেন। প্রসঙ্গ ক্রমে বলে রাখি, বেশীরভাগ মানুষই কিন্তু আমাকেও পছন্দ করে। আমি যাদের ভয়াবহ রকমের অপছন্দ করি তারাও আমাকে পছন্দ করে। সুলায়মান চাচা আজ এমন করছেন কেন বুঝতে পারলাম না। এমন না যে টিভিতে খুব মজার কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে। বেগুন চাষের সমস্যা নিয়ে টেকোমাথা এক লোক বকবক

করছে। লোকটার হাতে বিরাট একটা বেগুন। সুলায়মান চাচা এক দৃষ্টিতে বেগুনটার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন পৃথিবীর যাবতীয় রূপ–রস–গন্ধ ঐ বেগুনটা ধারণ করে আছে। বাড়িভাড়ার টাকাটাও গুনে দেখছেন না। যে কাজটা তিনি সব সময় করেন। গোনা শেষ করে এমনভাবে তাকান যেন শ'খানেক টাকা কম হয়েছে। এই সময় আমার বুক টিপ টিপ করতে থাকে।

'রেনু!'

'জ্বি।'

'রশিদ আমি পরে পাঠিয়ে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

জ্বি আচ্ছা বলার পরেও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তাকিয়ে আছি টিভির দিকে যেন আমিও ঐ বেগুনটাকে দেখে খুব মজা পাচ্ছি।

'রেনু।'

'জ্বি।'

'বসবি না–কি?'

'আপনি বললে বসব।'

সুলায়মান চাচা কিছু বললেন না। আমি নিজের থেকেই বসলাম। সুলায়মান চাচার ঠিক পাশে। যেন ইচ্ছা করলেই তিনি আমার পিঠে হাত রাখতে পারেন। মাঝে মাঝে কথা বলার সময় তিনি পিঠে হাত রাখেন। যেন আমি তাঁর সবচে' আদরের ছোট একটা মেয়ে। সুলায়মান চাচার আদর করে কথা বলার এই ভঙ্গিটা আমার খুব ভাল লাগে।

'রেনু!'

'জ্বি।'

'মনটা খুব খারাপ রে রেনু।'

'কেন?'

'জামাই তিনটা বড় বিরক্ত করছে।'

'সে তো সব সময়ই করে।'

'এবার বেশী করছে। এদের নিজেদের মধ্যে কোন মিল নেই। একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মিলের অন্ত নেই। তিনজন মিলে আমাকে ভাজা ভাজা করে ফেলছে।'

'তাঁরা চান কি?'

'তারা চায় বাড়িটা যেন আমি ওদের লিখে দি। ওরা বাড়ি ভেঙ্গে মাল্টিস্টোরিড এ্যাপার্টমেন্ট হাউস করবে।'

'আপনি কি বললেন?'

'এখনো কিছু বলিনি — রঞ্জুর কাছে পরামর্শ চেয়েছি। সেও কিছু বলছে না।'

'ভাইয়ার কাছে পরামর্শ চেয়ে লাভ নেই চাচা — ও এমন পরামর্শ দেবে যে রাগে আপনার গা জ্বলে যাবে।'

'আরে না — কি যে তুই বলিস। ওর পরামর্শ প্রথমে খুব হাস্যকর মনে হলেও শেষে দেখা যায় ঠিক আছে।'

'আপনার মেয়েরা কি বলে চাচা?'

'ওরা হচ্ছে হিজ মাস্টারস ভয়েস — জামাইরা যা বলে ওরা তাই বলে। আমাকে বুঝাতে চায় — শিখিয়ে দেয়া কথা নিজের মত করে বলার চেষ্টা করে — ভাঙ্গা বাড়ি দিয়ে তুমি কি করবে বাবা? বিশাল মাল্টিস্টোরিড কমপ্লেক্স হবে। সবচে' উপরের ফ্ল্যাটে থাকবে তুমি। হাত পা ছড়িয়ে বাস করবে। আমরা তিন বোন থাকব তোমার কাছাকাছি। এই বয়সে তো সেবা দরকার বাবা।'

সুলায়মান চাচা চুপ করে গেলেন। তাকিয়ে আছেন টিভির দিকে। টিভিতে ক্লোজ আপে বেগুনের পোকা দেখা যাচ্ছে। ভয়ংকর লাগছে পোকাগুলিকে। আমি বললাম, চাচা যাই?

তিনি কোন জবাব দিলেন না। পোকা দেখতে লাগলেন যেন পোকাদের ভেতর পৃথিবীর সব সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। সেই সৌন্দর্য আমাকে তেমন আকার্ষণ করল না। আমি ঠিক করলাম দুলু আপার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করব। যদিও আজ দুলু আপাদের বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ। শুক্রবার সন্ধ্যার পর তাদের বাড়িতে যাওয়া যায় না। দুলু আপার নিষেধ আছে। ঐ দিন দুলু আপার বাবা মদ্যপান করেন । অল্পতেই তাঁর নেশা হয়। তিনি হৈ চৈ করে নানা কাণ্ড করেন। দুলু আপা চান না সেই দৃশ্য আমি দেখি। ঐ দৃশ্য দেখার জন্যেই আমার শুধু শুক্রবারেই তাঁদের বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে। বেশ ক'বার গিয়েছি এখনো কিছু দেখিনি।

আমি চলে গেলাম দুলু আপার ঘরে। দোতলার শেষ প্রান্তে দুলু আপার ঘর। ছোট্ট একটা খাট, সঙ্গে লাগোয়া চমৎকার ড্রেসিং টেবিল। আয়নাটা প্রকাণ্ড। আয়নার সামনে দাঁড়ালে এম্নিতেই মন ভাল হয়ে যায়। ঘরের এক কোণায় পুরনো ধরনের রেডিওগ্রাম। বেশীর ভাগ সময়ই দুলু আপার ঘরে ঢুকলে গান শোনা যায়। রেডিওগ্রামে সাতটা রেকর্ড চাপানো থাকে। শেষ হলেই নতুন রেকর্ড চাপানো হয়।

আজ গান হচ্ছে না। দুলু আপার ঘরও অন্ধকার । আমি দরজার ফাঁক করে দেখি ঠাণ্ডা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে দুলু আপা শুয়ে আছেন। এটিও তাঁর এক অদ্ভুত অভ্যাস সিমেন্টের মেঝে সব সময় ধুয়ে মুছে রাখেন। বেশীর ভাগ সময় শুয়ে থাকেন মেঝেতে হাতে বই।

'দুলু আপা আসব?'

'আয়।'

'ঘর অন্ধকার কেন?'

'মাথা ধরেছে। আয় আমার পাশে বস।'

আমি বসতে বসতে বললাম, চাচা কোথায়?

দুলু আপা সহজ গলায় বললেন, নিজের ঘরেই আছেন। বাবাও আমার মত ঘর অন্ধকার করে বসে আছেন। ঐ দিকে খবর্দার যাবি না।

'চাচা কি করছেন?'

'জানি না কি করছে। আমের সরবত খাবি?'

'এখন তুমি আমের সরবত কোথায় পাবে?'

'ডীপ ফ্রীজে আম আছে। খেতে চাইলে বানিয়ে দেই। বেশীক্ষণ লাগবে না। দেব?'

'না।'

'অন্য কিছু খাবি?'

'উহুঁ। গান শুনব দুলু আপা।'

'দুলু আপা ক্লান্ত গলায় বললেন, আজ থাক। অন্যদিন শুনবি। আজ মনটা ভাল নেই।'

'আমি কি চলে যাব?'

'না। তোকে আমি একটা চিঠি পড়াব। মন দিয়ে পড়ে বলবি চিঠিটা কেমন হয়েছে।'

'তোমার লেখা চিঠি?'

'হ্যাঁ।'

'কাকে লিখেছ?'

'সেটা তোর জানার দরকার নেই। তুই শুধু পড়বি। বানান ভুল থাকলে ঠিক করে দিবি।'

'প্রেমপত্র না-কি?'

'এত কথার দরকার কি?'

'দাও পড়ি।'

দুলু আপা হাসতে হাসতে বললেন, দেবো। এত ব্যস্ত কেন? চিঠি পড়ে তুই একটা শক খাবি। এখন চুপচাপ বসে থাক। অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকার মধ্যে এক ধরনের মজা আছে। মাঝে মাঝে আমি কি করি জানিস? দরজা জানালা সব বন্ধ করে ঘর নিকষ অন্ধকার করি। তারপর মেঝেতে চুপচাপ বসে থাকি। অল্প কিছুক্ষণ বসে থাকলেই মনে হয় — অনন্তকাল পার হয়েছে। টাইম স্লো হয়ে যায়।

'চিঠিটা দাও দুলু আপা, পড়ি।'

দুলু আপা চিঠি দিলেন। রেডিওবণ্ড কাগজে গোটা গোটা করে লেখা দীর্ঘ চিঠি। বিষয়বস্তু হচ্ছে — পূর্ণিমা রাতে রাস্তার সোডিয়াম বাতিগুলি যদি নেভানো থাকে তাহলে নগরবাসীরা পূর্ণিমা উপভোগের সুযোগ পায়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালটি কি এই কাজটি করবে? ভরা পূর্ণিমার সময় রাত ১১টা থেকে রাত তিনটা পর্যন্ত রাস্তার সব বাতি নিভিয়ে দেবে? তখন তো চাঁদের আলোই থাকবে। কৃত্রিম বাতির প্রয়োজন কি?

'চিঠিটা কেমন?'

'ইন্টারেস্টিং।'

দুলু আপা হাসতে হাসতে বললেন, তুই মনে হয় আরো ইন্টারেস্টিং কোন চিঠি আশা করেছিলি? কি করেছিলি না?

'হুঁ।'

দুলু আপা বাতি নিভিয়ে দিয়ে বললেন, নিজ থেকে আমি কখনো কোন ছেলেকে চিঠি লিখব না। কখনো না।

'লিখলে ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি আছে। কেউ যদি আমার সেই চিঠি নিয়ে হাসাহাসি করে আমার খুব কষ্ট হবে।'

'এমন কাউকে লিখবে না যে তোমার চিঠি নিয়ে হাসাহাসি করবে।'

'যাকে লিখতে চাই সে তাই করবে। হাসহাসি করবে। সবাইকে পড়ে শোনাবে। চিঠির ভাষা নিয়ে ক্যারিকেচার করবে।'

'তোমার মনের কথা পৌঁছানো দিয়ে কথা। সে কি করবে না করবে তা দিয়ে তোমার প্রয়োজন কি?'

'তুই এসব বুঝবি না। আচ্ছা তুই এখন যা।'

দুলু আপার ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি সিঁড়ির মাথায় দুলু আপার বাবা। তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, স্লামালিকুম চাচা।

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন — কে? হু আর ইউ।

'চাচা আমি রেনু।'

'রেনুটা কে?'

'আমি ঐ বাড়িতে থাকি?'

'এখানে কি চাও?'

'কিছু চাই না।'

আমাদের কথাবার্তা শুনে দুলু আপা বের হয়ে এলেন। তাঁর বাবার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন — তুমি ঘরে যাও বাবা।

উনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরের দিকে রওনা হলেন। রেলিং ধরে ধরে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে টলতে টলতে যাচ্ছেন। আমি আগে মাতাল দেখিনি — এই প্রথম দেখলাম। বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল।

দুলু আপা বললেন, বাসায় যা রেনু। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

আমি ক্ষীণ গলায় বললাম, যাচ্ছি।

'তুই কি ভয় পেয়েছিস?'

'হুঁ।'

'কেন? বাবা কিছু বলেছে তোকে?'

'না।'

'তাহলে ভয় পেলি কেন? আয় আমি তোকে এগিয়ে দিচ্ছি।'

'এগিয়ে দিতে হবে না দুলু আপা।'

আমি সিঁড়ি বেয়ে নামছি। হঠাৎ মনে হল আমি নিজেও অবিকল দুলু আপার বাবার মতই টলতে টলতে নামছি। এক হাতে সিঁড়ির রেলিং ধরে আছি। সিঁড়ির গোড়ায় এসে পেছনে ফিরলাম। দুলু আপা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি খানিকটা মন খারাপ করে বাসায় ফিরলাম। দুলু আপাকে আমি বেশ পছন্দ করি। তাঁকে যতটা পছন্দ করি নিজের আপাকে ততটা করি না। মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় মীরা আপা আমার বোন না হয়ে দুলু আপা বোন হলে বেশ হত।

তার মানে এই না যে আপাকে আমি পছন্দ করি না। করি। তবে কেন জানি খানিকটা ভয় ভয়ও লাগে। একজন মানুষ খুব পরিচিত একজনকে তখনি ভয় করে

যখন সে তাকে বুঝতে পারে না। আপাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আগে আমরা দু'বোন একটা ঘরে ঘুমুতাম। বড় একটা খাট ছিল ঘরের মাঝখানে যাতে কাউকেই কিনারে শুতে না হয়। ঘুমুতে যাবার আগে আপা আমার চুল বেঁধে দিত। এই সময় হালকা গলায় গল্প গুজব করত। একদিন হঠাৎ বলল, রেনু, এখন থেকে তুই কি ভাইয়ার ঘরে শুবি? ওখানে তো এক্সট্রা চৌকি আছে। আমার একা ঘুমুতে ইচ্ছে করে।

আমি বললাম, আচ্ছা।

'তুই মন খারাপ করলি না তো?'

'না।'

'মাঝে মাঝে আমার খুব একা থাকতে ইচ্ছা করে। সব সময় না, মাঝে মাঝে।'

'বুঝতে পারছি।'

'না বুঝতে পারছিস না। এটা এত সহজে বোঝার জিনিস না।'

আমি চলে এলাম ভাইয়ার ঘরে। এম্নিতেই ঘরটা ছোট — তার উপর দুটা চৌকি। ঘরে ঢুকলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। তার উপর রোজ ভাইয়া রাত করে ফিরে। আমাকে দরজা খুলে দেবার জন্যে জেগে থাকতে হয়। ইদানীং আবার সিগারেট ধরেছে। ঘুমুবার আগে বিছানায় শুয়ে সিগারেট টানে। ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কি বিশ্রী অবস্থা। আমি একদিন বললাম, সিগারেট বারান্দায় খেলে কেমন হয়?

ভাইয়া পা নাচাতে নাচাতে বলল, ভালই হয় কিন্তু সব কিছুর একটা নিয়ম আছে। দিনের শেষ সিগারেট বিছানায় শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে খেতে হয়, এটাই নিয়ম। নিয়ম তো ভঙ্গ করতে পারি না। এই জন্যেইতো পা নাচাচ্ছি।

'আমার তো ভাইয়া দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'বুঝতে পারছি। বাট আই কান্ট হেল্প। আমার ঘরে বাস করলে এই কষ্ট সহ্য করতেই হবে। উপায় নেই।'

ভাইয়ার সঙ্গে বাস করার কিছু অসুবিধা যেমন আছে — সুবিধাও আছে। প্রায় রাতেই সে অনেকক্ষণ গল্প করে। মজার মজার গল্প। মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। কিছু কিছু গল্প তার নিজের বানানো — যেমন আধুনিক কালের ঈশপের গল্প। পুরানো গল্প — কাক মাংসের টুকরা নিয়ে গাছে বসেছে, শিয়াল এসে বলল — কাক ভাই তোমার গলাটা বড় মিষ্টি। একটা গান গাও না। কতদিন তোমার গলার মধুর কা – কা

ধ্বনি শুনি নি। ঈশপের গল্পে কাক তখন গান ধরে। কিন্তু ভাইয়ার গল্পে গান ধরে না। কারণ সৌভাগ্যক্রমে ঈশপের গল্পটি তার পড়া। সে এমন সব কাণ্ড কারখানা করে যে শুনে হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে আসে। এত কাণ্ড করেও কাকের শেষ রক্ষা হয় না — মাংসের টুকরা চলে যায় শিয়ালের পেটে। এই গল্পগুলি লিখে ফেললে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যেত কিন্তু সে লিখবে না।

ভাইয়ার ঘরে একটা টেবিল ফ্যান আছে — এইটি সে দিয়ে রাখে আমার দিকে। সে না-কি হিট প্রুফ — গরমে তার কিছু হয় না, বরং সুনিদ্রা হয়। এটা অবশ্য মিথ্যা কথা। গরম অসহ্য বোধ হওয়াতেই সে তার কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে এই ফ্যান নিয়ে এসেছিল। আমি তার ঘরে চলে আসায় বেচারাকে বাধ্য হয়ে ফ্যানটা আমাকে দিয়ে দিতে হয়েছে।

আপনি বোধ হয় ভাবছেন — মেয়েটা কি স্বার্থপর! নিজে ফ্যানের বাতাস খাচ্ছে — বড় ভাই গরমে সিদ্ধ হচ্ছে।

আসলে তা কিন্তু না। আমার ভাইয়ার মত চট করে ঘুম আসে না। ভাইয়া ঘুমুবার পরেও আমি অনেকক্ষণ জেগে থাকি। তারপর ফ্যানের মুখ ঘুরিয়ে দেই ভাইয়ার দিকে। ভাদ্রমাসের অসহ্য গরমে ছটফট করতে করতে ভাবি, একদিন যখন আমাদের খুব টাকা-পয়সা হবে তখন ঘরে ঘরে এয়ার কুলার থাকবে। সবগুলি ঘর থাকবে বরফের মত হিম শীতল। ভাদ্র মাসের গরমে লেপ গায়ে ঘুমুব।

রাত এখন বাজছে একটা দশ। আমি ভাইয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। বাবা অনেকক্ষণ জেগে ছিলেন, কিছুক্ষণ আগে ঘুমুতে গেলেন। ভাইয়া রাতে ভাত খাবার সময় না থাকায় তিনি বেশ মন খারাপ করেছেন। কিছু দিন বাইরে কাটিয়ে ফিরলেই বাবা সবাইকে নিয়ে খাওয়ার ব্যাপারটায় খুব গুরুত্ব দিতে থাকেন। আজ বিকেলে তিনি নিউ মার্কেট থেকে কাতল মাছের একটা বিশাল মাথা কিনে এনেছেন। সেই মাথার মুড়িঘণ্ট রান্না হল। রান্নার সময় বাবা পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন এবং মা'কে নানান উপদেশ দিতে লাগলেন — একটু ঝোল ঝোল রাখ, শুকনো হলে খেয়ে আরাম পাওয়া যাবে না। কয়েকটা আলু কুচি কুচি করে দিয়ে দাও — আলু গলে ঝোলটা ঘন করবে, খেতে আরাম হবে। পাঁচ ফোরণ আছে? এক চিমটি পাঁচ ফোরণ ডোজ দিয়ে দাও না — সুন্দর গন্ধ হবে। গোটা পাঁচেক আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দাও কাঁচামরিচের সুঘ্রাণ তুলনাহীন।

রান্নার এক ফাঁকে মা এসে আমাকে আর আপাকে চুপি চুপি বলে গেলেন, মাছের মাথাটা পচা ছিল — খেতে ভাল হবে না। তোর বাবাকে কিছু বলিস না, মনে কষ্ট পাবে। বেচারা শখ করে কিনেছে।

আপা বলল, পচা মাছ খেয়ে তো অসুখ করবে মা।

'এত পচা না। কষ্ট করে খেয়ে নিস মা —'

খাবার সময় মোটামুটি করুণ দৃশ্যের অবতারণা হল বলা যেতে পারে — বাবা নিজেই মাছ মুখে দিতে পারলেন না — মুখ কুঁচকে বললেন — মাথাটা পচা না–কি?

মা বললেন, না তো। টাটকা মাথা। কানকো লালটকটকে ছিল।

'খেতে এমন লাগছে কেন? পচা গন্ধ পাচ্ছি।'

আমি বললাম, তুমি উল্টা–পাল্টা ডিরেকশন দিয়ে মাছটা নষ্ট করেছ বাবা।

আপা বলল, আমার কাছে খেতে তো ভালই লাগছে।

বাবা বললেন, খেতে খারাপ হয় নি। গন্ধটা ডিসটার্ব করছে। রঞ্জু থাকলে এই গন্ধ নিয়ে কিছু একটা বলে সবাইকে হাসিয়ে মারত। ও কি রোজ ফিরতে দেরী করে?

আমি বললাম, মাঝে মাঝে করে।

'এটা ঠিক না। ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে। ঢাকা শহর এখন আগের মত সেফ না — । রাত বিরেতে চলাচল বন্ধ করতে হবে। আমি আজ ওকে বলব। কড়া গলায় বলব — অবশ্যি তাকে কড়া গলায় কিছু বলাও মুশকিল। ফানি ম্যান। এমন কিছু বলবে যে হাসতে হাসতে জীবন যাবে।'

বলেই বাবা হাসতে লাগলেন। সেই হাসি থামতে সময় লাগল। হাসি থামে, দু'এক নলা ভাত খান। আবার হাসেন।

ভাইয়া ফিরল রাত দেড়টায়। ঘরে ঢুকেই বলল, খুকী জেগে আছিস? আমার দু'টা ডাক নাম, একটা খুকী, অন্যটা রেনু। খুকি নামে এখন কেউ ডাকে না, আমি নিষেধ করে দিয়েছি। কেউ যদি ভুল করেও ডাকে আমি রাগারাগি করি। শুধু ভাইয়া ডাকে। আমাকে রাগাবার জন্যেই ডাকে। রাগ করলে আরো বেশী ডাকবে বলে চুপ করে থাকি। ভাইয়া সার্ট খুলতে খুলতে বলল, কথা বলছিস না কেন? জেগে আছিস না–কি?

'না ঘুমিয়ে আছি। আচ্ছা ভাইয়া, এত দেরী করলে? বাবা তোমার জন্যে এতক্ষণ জেগেছিলেন। রাতে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আমরা ভাত খেয়েছি এগারোটার সময়।'

'মেনু ছিল কি?'

'মাছের মাথা — মুড়িঘণ্ট। বাবা নিজে মাথা কিনে আনলেন।'

ভাইয়া শুকনো গলায় বলল, নিশ্চয়ই পচা ছিল। আজ পর্যন্ত কোনদিন বাবা টাটকা মাথা কিনতে পারেন নি। আমি একশ টাকা বাজি রাখতে পারি, মাথাটা ছিল পচা তোরা কেউ খেতে পারিস নি।'

'মাথা ভালই ছিল। ভাইয়া তুমি কি খেয়ে এসেছ না খাবার গরম করব?'

'খেয়ে এসেছি — আভা আজ তাদের বাসায় নিয়ে গেল। আভার মা খাইয়ে দিলেন।'

'কোন আভা?'

'এমন ভাবে বললি যেন দশ বারোটা আভার সঙ্গে আমার খাতির। কথাবার্তা চিন্তা-ভাবনা করে বল। প্রশ্ন করতে হয় বলেই যে বলতে হবে — কোন আভা? তাতো ঠিক না।'

'সরি।'

'সরি হলে ভাল — তুই এখন যা, আমার জন্য ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা বানিয়ে আন। আজ সারারাত জাগতে হবে। পত্রিকায় একটা ভাল এ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছি। প্রচ্ছদ কাহিনী — বিষয় হল, "ঢাকা শহরে ভ্রাম্যমান পাগল"। ঠিকঠাক মত নামাতে পারলে এক হাজার টাকা পাওয়া যাবে। আভা আমাকে সাহায্য করছে। ও নেবে চারশ — আমি ছ'শ . . .।'

আভা নামের মেয়েটির কথা ভাইয়ার মুখে কয়েকবার শুনেছি, এখনো দেখিনি। আমাদের বাসায় কখনো আসেনি। মেয়েটা শতদল পত্রিকায় কাজ করে। ভাইয়ার ভাষায় খুব 'ফাইটিং টাইপ' মেয়ে — বেঁচে থাকার জন্য 'ফাইট' দিয়ে যাচ্ছে। মানি প্ল্যান্ট জাতীয় মেয়ে না — ছোট ছোট তিনটা ভাই বোন, অসুস্থ মা — সে একা রোজগার করছে। দিন রাত পরিশ্রম করছে।

'কি রে খুকি এখনো দাঁড়িয়ে আছিস, ব্যাপার কি? চা নিয়ে আয়। ফ্লাস্ক ভর্তি করে আনবি?'

'ফ্লাস্ক পাব কোথায়?'

'ঐদিন যে একটা দেখলাম?'

'দুলু আপাদের ফ্লাস্ক।'

'ও আচ্ছা, তাহলে তো তোর কাজ বেড়ে গেল। তোকেও জেগে থাকতে হবে

— ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাকে চা খাওয়াতে হবে। ছোট বোন হয়ে জন্মানোর অনেক যন্ত্রণা।'

আমি বললাম, আভা মেয়েটা দেখতে কেমন?

'ভেরি অর্ডিনারী। সাজলে গুজলে হয়ত সুন্দর দেখাবে। সাজার সময় কোথায়? সাজতে তো পয়সাও লাগে। পয়সা কোথায়? একটা মাত্র ঘর সাবলেট নিয়ে এতগুলি মানুষ থাকে। কি ভাবে বাস করে না দেখলে বিশ্বাস করবি না। আমি ওদের বাসায় গিয়ে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলাম. বুঝলি খুকী? আমার ধারণা ছিল — আমরাই বোধ হয় সবচে' গরীব। ওদের বাড়িতে রাতে কি রান্না হয়েছে জানিস — শুধু ভাত আর ডাল। স্বাস্থ্যবান ভাত ইয়া মোটা মোটা।'

'তুমি ডাল ভাত খেয়ে এলে?'

'না, আভা গিয়ে আমার জন্যে ডিম কিনে নিয়ে এল। সেই ডিম ভাজা হল। আভার একটা ছোট বোন আছে তার নাম শেফা। সে খুব গোপনে ফ্রকের আড়ালে একটা বাটি নিয়ে গেল পাশের বাড়ি। সেখান থেকে খানিকটা মাছের তরকারীও এল।'

ভাইয়া হাত-মুখ ধুয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি চা বানিয়ে আনলাম। ভাইয়া বলল, এক কাজ কর তো খুকী। তোর ফ্যানটা আমাকে ধার দে। বড্ড বেশী গরম। আর শোন, একটা গামছা ভিজিয়ে আমার পিঠের উপর দিয়ে দে। তাহলে মশা বিশেষ কায়দা করতে পারবে না। শরীরটাও ঠাণ্ডা থাকবে।

আমি ভাইয়ার পিঠে ভেজা গামছা দিয়ে বারান্দায় মোড়া পেতে বসলাম। ঘরে আলো থাকলে আমার ঘুম হয় না। এরচে' বারান্দায় বসে থাকা ভাল। বারান্দায় খানিকটা বাতাস আছে। বসে থাকতে খুব খারাপ লাগছে না।

আমি চুপচাপ বসে আছি। দুলু আপা গান বাজনো শুরু করেছেন। তাঁর মন-খারাপ ভাবটা সম্ভবত কেটেছে। একজন মানুষ বেশীক্ষণ যেমন মন ভাল রাখতে পারে না — বেশীক্ষণ মন খারাপও রাখতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়াও করেছেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় কেউ গান শুনতে পারে না। সংগীত ক্ষুধার্ত মানুষের বিষয় নয়।

ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না —
ওকে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে . . .

দুলু আপার অসংখ্য রেকর্ড কিন্তু গভীর রাতে তিনি অল্প কিছু গান ঘুরে ফিরে বাজান। কোন কোন রাতে এমন হয় যে একই গান বার বার বাজাচ্ছেন। কে জানে আজ হয়ত এই গানটাই পঞ্চশবার বাজাবেন।

বসে থাকতে থাকতে আমার ঝিমুনি ধরে গেল। ভাইয়ার ঘরের দরজা বন্ধ বলেই বারান্দা অন্ধকার হয়ে আছে। এখন বেশ বাতাস ছেড়েছে। বারান্দায় পাটি পেতে ঘুমুতে পারলে ভাল হত। আকাশে মেঘ করেছে। কয়েকবার বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টি নামলে খুব ভাল হয়। আরাম করে ঘুমানো যায়। এবার গরমটা বেশী পড়েছে। ভাইয়া ভেতর থেকে চেঁচাল।

'ও খুকি চা দে।'

আমি আবার চা বানিয়ে আনলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। দুলু আপা একই গান বারে বারে বাজাচ্ছেন —

'ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না —
ওকে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে . . .'

ভাইয়া চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, আমাকে যদি বলতো ঢাকা শহরের গৃহবন্দী পাগলের উপর প্রচ্ছদ কাহিনী লিখতে — আমি সবার প্রথমে লিখতাম তোর দুলু আপার কথা। দেখ একই গান বার বার বাজাচ্ছে। এই ভাবে মানুষকে বিরক্ত করার কোন মানে হয়? — ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না . . . কান ঝালাপালা হয়ে গেল। যাকে ধরিলে ধরা দেবে না তাকে ধরার জন্যে এত মাতামাতি কেন? ছেড়ে দাও চড়ে খাক। ইশ কি বিরক্ত যে এই মেয়েটা করে।

'তুমি জেগে আছ তাতো আর উনি জানেন না? তোমার লেখা এগুচ্ছে কেমন?'

'মোটেই এগুচ্ছে না। শুরুটা নিয়েই সমস্যা — একটা ইন্টারেস্টিং ওপেনিং দরকার — সেটা পারছি না। যাকে বলে শুরুতেই পাঠককে একটা চমক দেয়া — দেখ্ তো এই শুরুটা তোর কাছে কেমন লাগে — তুই পড়বি না আমি পড়ে শোনাব?

'তুমিই পড়ে শোনাও। তোমার হিজিবিজি হাতের লেখা আমি পড়তে পারি না।'

ভাইয়া পড়তে শুরু করল — "ধরুন, আপনি ঢাকা শহরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন পুরোপুরি নগ্ন একজন মানুষ আইল্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ট্রাফিক কনট্রোল করছে। ট্রাফিক পুলিশ যে ভাবে বাঁশি বাজায় সেই ভাবেই পিপ পিপ করে মুখে বাঁশি বাজানোর আওয়াজ করছে — তখন আপনি কি করবেন? বিরক্ত হবেন? তার সিগন্যাল উপেক্ষা করে গাড়ি নিয়ে পার হয়ে যাবেন না-কি সিগন্যাল মানবেন?

নওয়াবপুর রোডের মোড়ে এক পাগল ট্রাফিক কনট্রোল করে — যার সিগন্যাল সবাই মানে। সে যখন হাত উঠিয়ে গাড়ি থামতে বলে তখন সব গাড়ি থামে। চলতে বললে চলে। বদ্ধ উন্মাদ এই ব্যক্তি ট্রাফিক কনট্রোল করে খুব সুন্দর ভাবে। মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ তার কাছে দায়িত্ব দিয়ে চা-টা খেতে যায়। খুকি ঘুমিয়ে পড়েছিস?"

'না —শুনছি।'

'কেমন লাগছে?'

'ভাল। সত্যি এমন কেউ আছে না-কি?'

'অবশ্যই আছে। আমি তো গল্প লিখছি না। সত্য অনুসন্ধানী রিপোর্ট। আভা যখন এই লোকটার কথা বলল তখন আমি নিজেও বিশ্বাস করি নি। আভা আমাকে নিয়ে গেল। পাগলটার সঙ্গে কথা-টথা বললাম। ভেরী ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার!'

'সত্যি পাগল?'

'হুঁ — যাই জিজ্ঞেস করি হাসে আর বলে — 'খিস' 'খিস'।'

'ভাইয়া আমি বারান্দায় চাদর পেতে শুচ্ছি — তোমার লেখা শেষ হলে আমাকে ডেকে দিও।'

'তোকে মনে হয় কষ্টের মধ্যে ফেললাম — কাল ছুটি আছে সারাদিন ঘুমুতে পারবি। আজ একটু কষ্ট কর। শেষ বারের মত এক কাপ চা নিয়ে আয়।'

চা এনে দেখি লেখা খাতার উপর মাথা রেখে ভাইয়া ঘুমুচ্ছে —।

ভাইয়াকে জাগালাম না। বাতি নিভিয়ে দিলাম। ঘড়িতে রাত সাড়ে তিনটা বাজে। এখন আর ঘুমুতে যাবার কোন মানে হয় না। ঘুম আসতে আসতে আধঘণ্টা লাগবে। তারপর যেই ঘুমটা আসবে, ভোর হবে। ঘরে রোদ ঢুকে যাবে। জেগে উঠতে হবে। আধঘণ্টা, একঘণ্টা ঘুমুনোর চেয়ে না ঘুমানো ভাল।

আমি বারান্দায় চলে এলাম। এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাচ্ছি। চারদিক নীরব। দুলু আপা গান বাজানো বন্ধ করেছেন। যাকে তিনি ধরতে চাচ্ছেন তাঁকে ধরবার আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি সম্ভবত ঘুমুতে গেছেন।

এইখানে আমি আপনাকে একটা কথা বলি — সারারাত জেগে থাকার বিশ্রী অভ্যাস আমার আছে। কোনই কারণ নেই অথচ আমার ঘুম আসছে না। আমি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছি এ রকম প্রায়ই হয়। হাঁটাহাঁটি করতে করতে আমি অনেক কিছু চিন্তা করি। আমার খুব ভাল লাগে। কি নিয়ে চিন্তা করি তার সব আপনাকে বলা যাবে না। আপনি হাসবেন। এবং মনে মনে বলবেন — মেয়েটা তো ভারী ইয়ে

শুধু একটা চিন্তার কথা বলি — চিন্তা না — কল্পনা। আমি কল্পনা করি যেন রাতের ট্রেনে আমি যাচ্ছি। কামরায় দু'টি মাত্র মানুষ। আমি এবং একটি ছেলে। ছেলেটিকে আমি আগে কখনো দেখিনি। অল্প বয়স, সুন্দর চেহারা। বড় বড় চোখ। চোখে চশমা। খুব বৃষ্টি নেমেছে। ছেলেটা ট্রেনের কামরার জানালা বন্ধ করছে। আমার জানালাটা খোলা। সে বিরক্ত হয়ে বলল, জানালা বন্ধ করছেন না কেন?

আমি বললাম, তাতে আপনার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?

'আপনি তো ভিজে যাচ্ছেন।'

'আমাকে শুকনা রাখার দায়িত্ব তো আপনাকে দেয়া হয় নি। আমার বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছা হচ্ছে — ভিজছি . . . '

এই কথায় ছেলেটা একটু যেন আহত হল। নিজের দিকের জানালা খুলে সেও আমার মত জানালা দিয়ে মাথা বের করে ভিজতে লাগল। আমি বললাম, আপনি ভিজছেন কেন?

'ইচ্ছে হচ্ছে ভিজছি।'

'আপনার অসুখ করতে পারে। বৃষ্টির পানি সবার সহ্য হয় না। আমার অভ্যাস আছে। আমার কিছু হয় না।'

'আমারো অভ্যাস আছে। আমারো কিছু হয় না।'

'না আপনার অভ্যাস নেই। অভ্যাস থাকলে বৃষ্টি নামা মাত্র খটাখট জানালা বন্ধ করতেন না। তাছাড়া আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি শীতে আপনি কাঁপছেন। নির্ঘাৎ অসুখ বাঁধাবেন।'

'অসুখ বাঁধালে আপনার কি?'

'আচ্ছা আপনি এমন অবুঝের মত আচরণ করছেন কেন? কথা শুনছেন না কেন?'

আমার চিন্তাগুলি হচ্ছে এই রকম কথার পিঠে কথা তৈরি করা। ছেলেমানুষী খেলা। একা থাকলেই আমার এই খেলাটা খেলতে ইচ্ছা করে। সব খেলার শেষেই ক্লান্তি আসে। আমার এই খেলায় কখনো ক্লান্তি আসে না। যাই হোক, যা বলছিলাম — আমি বারান্দায় হাঁটছি — এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাচ্ছি — তখন হঠাৎ করেই ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনলাম। একজন কে কান্না চাপতে চেষ্টা করছে — পারছে না। আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম — কাঁদছে আপা। এই কান্না প্রচণ্ড কষ্টের কান্না।

আপা কেন এরকম করে কাঁদবে? এমন কি কষ্ট আছে তার? আমি অবাক হয়ে আপার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। যাতে সে একা একা কাঁদতে পারে এই জন্যেই কি সে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে? এই কারণেই কি তার মাঝে মাঝে একা থাকতে ইচ্ছা করে?

আমি আপার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম, আপা, আপা। কান্না থেমে গেল; আপা কোন উত্তর দিল না।

কাক ডাকছে। ভোর হতে শুরু করেছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি আপার ঘরের সামনে। যদিও ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে এতটুকুও ভাল লাগছে না। এই বাড়ির সঙ্গে গাছ গাছালিতে ভর্তি যদি কোন বাগান থাকতো আমি দাঁড়াতাম বাগানের ঠিক মাঝখানে।

৩

পচা মাছের মাথা খেয়ে আমাদের কিছু হলো না, বাবার খুব শরীর খারাপ করল। পেট নেমে গেল, সেই সঙ্গে যুক্ত হল বমির উপসর্গ। ভাইয়া বলল, কলেরা বাঁধিয়ে বসেছ না-কি বাবা?

বাবা ক্ষীণ স্বরে বললেন, বাঁচব না রে। বাঁচব না। আমার দিন শেষ।

বাবার এই ঘোষণায় আমরা বিশেষ বিচলিত হলাম না কারণ সামান্য অসুখ বিসুখেই তিনি এজাতীয় ঘোষণা দেন যা মাকে খুব কাবু করে ফেলে। মা এবারো খুব কাবু হয়ে পড়লেন, ভাইয়াকে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, একটা ভাল ডাক্তার আন। মানুষটা মরে যাচ্ছে দেখছিস না?

ভাইয়া সহজ গলায় বলল, যে কোন ডাক্তারই আসুক বাবাকে স্যালাইন ওয়াটারই দেবে। কাজেই চুপ করে বসে থাক। চিন্তার কিচ্ছু নেই। বাবার শরীর থেকে পচা মাছের সর্বশেষ অংশটা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাস্ত এবং বমি চলতেই থাকবে।

' কি করে বুঝলি? তুই কি ডাক্তার?'

'এসব বুঝার জন্যে ডাক্তার হওয়া লাগে না মা। এগুলি হচ্ছে কমন সেন্স। আমার অন্য কোন সেন্স না থাকলেও কমন সেন্স খুব ভাল। কাল পরশুর মধ্যে দেখবে বাবা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছে।'

'যদি না বসে?

'তখন ডাক্তার আনব।'

বড় ডাক্তার আনতে হল না। বাবা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বরিশাল যাবার জন্য। বরিশাল থেকে সুপারি কিনে আনতে হবে। এইটাই না-কি ঠিক সময়।

মা অবাক হয়ে বললেন, এই শরীর নিয়ে তুমি বরিশাল যাবে কি করে?

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি তো আর সাঁতার দিয়ে যাব না। লঞ্চে করে যাব। ডেকে বিছানা করে হাওয়া খেতে খেতে যাব।

মা বললেন, তোমাকে আর ছোটাছুটি করতে হবে না, ঘরে বসে থেকে যা

পার কর। সংসার তুমি যতদিন পেরেছ টেনেছ। এখন রঞ্জু টানবে।

বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, ও টানবে কেন? এটা কি ওর সংসার না আমার সংসার? আমার ব্যবসার যা ধারা — ঘরে বসে থাকলে চলবে না জায়গায় জায়গায় যেতেই হবে।

'ঠিক আছে। শরীর সারুক তারপর যাবে। এখন রঞ্জুকে গুছিয়ে বলে দাও ও সুপারি কিনে আনবে।'

'ও সুপারি কি কিনবে? সবাইকে দিয়ে সবকিছু হয় না। ঢাকা শহরে ভ্রাম্যমান পাগল কত প্রকার ও কি কি ওকে জিজ্ঞেস কর — ও বলে দেবে। সুপারির দর জিজ্ঞেস কর বলতে পারবে না।'

শরীর পুরোপুরি না সারতেই বাবা বরিশাল যাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। আমরা সবাই প্রবল আপত্তি করলাম। শুধু আপা বলল — বাবা বাইরে গেলে ভালই হবে। অনেকদিন ঘরে থেকে মনটন খারাপ হয়ে আছে। আগের মত ঘোরাঘুরি শুরু করলে শরীর আরো তাড়াতাড়ি সারবে।

বাবার সবগুলি প্যান্ট ঢিলা হয়ে গেছে। পিছলে পড়ে যায়। বেল্ট নেই কাজেই পায়জামার দড়ি দিয়ে প্যান্ট পরা হল। তিনি এক হাতে স্যুটকেস অন্য হাতে দু'বাটির ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বিকেল চারটায় রিক্সায় উঠে বসলেন। তাঁর লঞ্চ ছ' টায়। ট্রাফিক জামে পড়ে যেন লঞ্চ মিস না করেন সে জন্যেই এত সাবধানতা।

'চার দিনের মাথায় চলে আসব। খুব বেশী হলে এক সপ্তাহ। চিন্তার কোন কারণ নাই — আল্লাহ হাফেজ।'

বাবা বাড়ি থেকে বেরুলেই মা মন খারাপ করেন। এবার অনেক বেশী মন খারাপ করলেন কারণ আগের রাতে তিনি না-কি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। মা'র দুঃস্বপ্নগুলি সাধারণত খুব জটিল হয়।

এটা তেমন জটিল না।

এক অন্ধ লোক ভিক্ষা চাইতে এসেছে। বাবা ভিক্ষা দিতে যাচ্ছেন, মা আপত্তি করছেন — ওর কাছে যেও না, ও আসলে ভিক্ষুক না, খুনী। ও তোমাকে খুন করবে। বাবা মা'র কথা শুনলেন না। কাছে গেলেন। অন্ধলোকটা তখন বিকট শব্দে হেসে উঠল। মা'র ঘুমও ভেঙ্গে গেল।

বাবার রিকশা বড় রাস্তায় পড়ার আগেই মা আমাদের কাজের মেয়েটিকে একটা কালো রঙের মুরগী কিনতে পাঠালেন। আগামীকাল ভোরে এই মুরগী কোন একজন অন্ধ ভিখারীকে ছদকা দেয়া হবে।

রাত বারোটার দিকে আমরা সবাই যখন ঘুমুতে যাচ্ছি — বাবা এসে উপস্থিত। ভাইয়া অবাক হয়ে বলল, ব্যাপার কি? বাবা হাসতে হাসতে বললেন, ব্যাপার কিছু না। হঠাৎ একটা জিনিস মনে পড়ল চলে এলাম।

'কি মনে পড়ল?'

'না মানে, আগামীকাল দিনটা একটা বিশেষ দিন। ভুলেই গিয়েছিলাম . . . লঞ্চে উঠে মনে পড়ল, চলে এলাম। একদিন পরেই যাই একদিনে কি হবে?'

'বিশেষ দিন মানে? কি হয়েছিল এই দিনে?'

'সে বিরাট ইতিহাস। আরেক দিন বলব।'

'আরেক দিন বললে হবে না। আজই বলতে হবে।'

দেখা গেল — তেমন বিরাট ইতিহাস কিছু না। এই দিনে বাবা মা'র সঙ্গে প্রথম কথা বলেছেন। সেই কথাও নিতান্ত গদ্য ধরনের কথা। বাবা মা'র বাড়িতে অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করার পর মা দরজা খুললেন। বাবা বললেন, এটা কি জয়নাল সাহেবের বাড়ি?

মা বললেন, হুঁ।

'উনাকে একটু ডেকে দাও।'

'উনি বাড়িতে নাই।'

বাবা চলে এলেন এবং আধঘণ্টা পর আবার গেলেন। আবারো একই কথাবার্তা হল। বাবা ফিরে এসে আবার আধঘণ্টা পর গেলেন। এইবার মা হেসে ফেলে বললেন, আপনি বার বার চলে যাচ্ছেন কেন? বসেন। বাবা বসলেন।

ভাইয়া বলল, ঐদিনই কি তোমরা দু'জন দু'জনের প্রেমে পড়লে?

'আহ্ কি সব প্রশ্ন । তোর মা-কি ঘুমুচ্ছে না-কি? ডেকে তোল্। বিশেষ দিনটার কথা তোর মা'র মনে আছে কি-না কে জানে।'

বিশেষ দিনটার কথা মা'রও মনে ছিল। তবে দিনটির প্রসঙ্গে মা'র বর্ণনা এবং বাবার বর্ণনা এক না। মা'র কথা মত বাবা পরপর তিনবার জয়নাল সাহেবের খোঁজ করলেন এবং প্রতিবারই বললেন, এক গ্লাস পানি খাব। শেষবার মা পানি দেন নি। লেবুর সরবত বানিয়ে দিয়েছিলেন। পানি ভেবে বাবা এক চুমুক দিলেন — তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মুখ তুলে মা'র দিকে তাকাতেই মা হেসে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

মা'র দৌড়ে পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা অবশ্যি আমার অনুমান। ঘটনা এমনই ঘটার কথা। আমার ভেবে খুব অবাক লাগে যে বাবা-মা'র চরিত্রের অসম্ভব রোমান্টিক দিকটি আমাদের তিন ভাই বোন কারোর মধ্যেই নেই। আপার

মধ্যেতো ছিটেফোটাও নেই। ভাইয়ার মধ্যেও নেই — থাকলে দুলু আপার আবেগ তাঁর চোখে পড়ত। আমার নেই এইটুকু বলতে পারি। ছেলেরা যখন ভাব জমানো কথা বলে আমার কেন জানি গা জ্বলে যায়।

আমার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বান্ধবী আছে, মেরিন। তার বড় ভাই আর্কিটেকচারে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। আমাকে দেখলেই গদগদ ভাব করে। এমন বিশ্রী লাগে! সেদিন বলল, তোমার রেনু নামটা আমার পছন্দ না। তোমাকে এখন থেকে স্বর্ণরেনু ডাকলে কি তোমার খুব আপত্তি আছে?

আমি বললাম, কোন আপত্তি নেই, তবে আমিও এখন থেকে আপনাকে কবীর ভাই না ডেকে ডাকব — তাম্র কবীর ভাই। আপনার আপত্তি নেই তো?

কবীর ভাই খুবই হকচকিয়ে গেলেন। মেয়েরা কথার পিঠে কথা বললে ছেলেরা ঠিক তাল রাখতে পারে না। তাদের চিন্তা ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়। অকারণে রাগও করে। কবীর ভাই যে ঐ দিন খুব রাগ করেছিলেন তার প্রমাণ হল পরদিনই মেরিন আমাকে বলল, রেনু তুই আমার ভাইয়াকে অপমান করেছিস, ব্যাপার কি?

আমি বললাম — অপমান করিনি তো।

'তুই ভাই, আমাদের বাসায় আর আসিস না। ভাইয়া খুব রাগ করেছে।'

আমি মেরিনদের বাসায় আর যাই নি তবে কবীর ভাইয়ের সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হল। তিনি রিকশায় করে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন — আমি রাস্তার সবাইকে সচকিত করে ডাকতে লাগলাম — তাম্র ভাই, তাম্র ভাই।

রাগ, দুঃখ এবং বিস্ময়ে বেচারার মুখ কাল হয় গেল। তিনি রিকশা থামালেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, কোন দিকে যাচ্ছেন?

'কেন?'

'আমার পথের দিকে হলে, আপনার সঙ্গে খানিকটা যেতাম। দুপুর রোদে হাঁটতে ভাল লাগছে না।'

'তুমি কোনদিকে যাবে?'

'এলিফেন্ট রোড।'

'আমি ঐদিকে যাচ্ছি না। আর শোন একটা কথা — তাম্র ভাই, তাম্র ভাই করছ কেন?'

'তাম্র কবীর ভাই বললে অনেক বড় হয়ে যায় এই জন্যে শর্ট করে বলছি। আপনি রাগ করলে আর বলব না।'

কবীর ভাই তীব্র দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁপা কাঁপা গলায়

বললেন — বেয়াদবী করবে না। বেয়াদবী করার বয়স তোমার এখনো হয় নি।

আমি কিন্তু বেয়াদবী করতে চাই নি। মজাই করতে চেয়েছিলাম। মজা করারও বোধ হয় বয়স আছে। সব বয়সে মজা করা যায় না। আমি ঠিক করে রেখেছি এর পরে যদি কখনো কবীর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় আমি খুব বিনয়ী ব্যবহার করব। হেসে হেসে কথা বলব। এখনো তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।

বাবা বরিশাল চলে যাবার পর পরই মা অসুখে পড়লেন। তেমন কিছু না, জ্বর।

ভাইয়া বলল, এই জ্বরের নাম হচ্ছে বিরহ-জ্বর। বাবার বিরহে কাতর হয়ে মা'র জ্বর এসে গেছে। হা-হা-হা।

মা'র শরীর খারাপ হওয়ায় আমার একটা লাভ হয়েছে — আমি এখন রাতে মা'র ঘরে ঘুমুচ্ছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে বাবা যখন থাকেন না তখনো মা' তার ঘরে একা থাকেন। আমাকে বা আপাকে তাঁর সঙ্গে ঘুমুবার জন্যে বলেন না। কোন্ ছোটবেলায় মা'র সঙ্গে ঘুমিয়েছি মনেই নেই। বড় হয়ে ঘুমুতে এসে লক্ষ্য করলাম, আমার কেমন জানি লজ্জা লজ্জা লাগছে। একটু সংকোচও লাগছে। যেন আমি অনধিকার প্রবেশ করছি। এই ঘরটা মা'র নিজের একটা জগৎ। এই জগতে আমার বা আমাদের কোন স্থান নেই। ঘরটা মা এবং বাবার।

মা'র সঙ্গে ঘুমানোর প্রাথমিক সংকোচ দ্বিতীয় রাতেই কেটে গেল। লক্ষ্য করলাম মা এমন ভাবে আমার সঙ্গে গল্প করছেন যেন তিনি আমার একজন বান্ধবী। বাতি নিভিয়ে গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, মীরা মাঝে মাঝে খুব কান্নাকাটি করে। কেন করে তুই জানিস?

'না।'

'কাঁদে যে সেটা জানিস?'

'জানি।'

'কখনো জিজ্ঞেস করিস নি?'

'না।'

'জিজ্ঞেস করা উচিত না?'

'তুমি যদি বল তাহলে জিজ্ঞেস করব।'

'থাক, জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। বলার হলে নিজেই বলবে।'

'এই ভেবেই আমি কিছু জিজ্ঞেস করি নি মা।'

'ভাল করেছিস। আচ্ছা, রঞ্জু কি বিয়ে টিয়ের কথা কিছু ভাবছে?'

'জানি না তো মা।'

'দুলু মেয়েটাকে কি ও পছন্দ করে?'

'করে নিশ্চয়ই, তবে খুব করে বলে মনে হয় না।'

মা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আর পছন্দ করলেই বা কি। ওরা তো আর রঞ্জুর সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবে না। ওরা কোথায় আর আমরা কোথায়। আচ্ছা রেনু, দুলুর বাবা মন্ত্রী হচ্ছে এটা কি সত্যি?

'জানি না তো। কে বলল তোমাকে?'

'শুনলাম।'

'হতেও পারে। খুব টাকা-পয়সাওয়ালা মানুষজনই তো মন্ত্রী হয়। উনার তো টাকা পয়সার অভাব নেই।'

'মন্ত্রী হলে ভালই হয়।'

'ভাল হবে কেন?'

'উনাকে ধরলে হয়ত তখন রঞ্জুর চাকরির একটা ব্যবস্থা হবে। আমরা প্রতিবেশী, আমাদের একটা কথা কি আর উনি ফেলবেন?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, মন্ত্রীরা কারো কথাই ফেলেন না মা। তাঁদের বিশাল একটা কালো বাক্স আছে — সবার কথাবার্তা তাঁরা ঐ বাক্সে রেখে তালা দিয়ে দেন। ঐ তালা আর খুলেন না।

মা হাসতে হাসতে বললেন, তুইও দেখি রঞ্জুর মত হয়ে যাচ্ছিস। মজা করে কথা বলিস। আচ্ছা শোন, রঞ্জু ঐ দিন আভা নামের কি একটা মেয়ের কথা বলছিল। ঐ মেয়েটিকে কি তার পছন্দ?

'জানি না মা। ভাইয়া হচ্ছে এমন এক জাতের ছেলে কাউকেই যাদের খুব অপছন্দও হয় না আবার পছন্দও হয় না। এরা পছন্দ করে শুধু নিজেকে আর কাউকে না।'

মা হাসতে হাসতে বললেন, তুই বুঝলি কি করে?

আমি বললাম, আমি নিজেও অবিকল ভাইয়ার মত, এই জন্যে বুঝেছি।

সাত দিনের ভেতর বাবার ফেরার কথা, তিনি ফিরলেন না। তাঁর একটা চিঠি এল। এবার পোস্ট কার্ড না। খামে ভরা চিঠি। বিশেষ কাউকে লেখা না। সবার উদ্দেশ্যে লেখা —

পর সমাচার এই যে সুপারি কিনিতে পারি নাই। এইবার সুপারির দর অত্যধিক। ঝড়ে ফলন হয় নাই। অধিকাংশ সুপারির গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অধিক দামে সুপারি ক্রয় করিতে পারি — তাহাতে খুব লাভ হইবে না। কারণ বেনাপোল দিয়া পাটনার সুপারি দেশে আসিতেছে। তা দামেও সস্তা। কাজেই সিদ্ধান্ত নিয়াছি খুলনায় যাইব, অন্য কোন ব্যবসার সন্ধান দেখিব। সেখানে মধু সস্তা তবে মধুর তেমন বাজার নাই। প্রচুর বিদেশী মধু দেশে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া অস্ট্রেলিয়ার মধু দামেও সস্তা, গুণগত মানও খারাপ না। যাই হউক, এইসব নিয়া তোমরা চিন্তা করিবে না। আমি ভাল আছি। খাওয়া দাওয়া খুব সাবধানে করিতেছি। বাহিরের খাদ্য গ্রহণ করিতেছি না। স্বপাক আহার করিতেছি। আল্লাহর অসীম করুণায় স্বপাক খাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খুব শীঘ্র তোমাদের সহিত সাক্ষাত হইবে। ইতি . . .

মা'র জ্বর সেরে গেছে। তিনি কাজকর্ম শুরু করেছেন। তবে তাঁকে দেখলে খুব দুর্বল এবং মনমরা মনে হয়। তাঁর রাতে ঘুম হয় না। যতবার আমি জাগি, দেখি মা একটা হাতপাখা দুলাচ্ছেন। এই ঘরের একটা সিলিং ফ্যান ছিল, সেটা নষ্ট। ঠিক করানো হচ্ছে না কারণ আমরা আবার টাকা পয়সার কষ্টে পড়ে গেছি। ভাইয়ার শতদল পত্রিকাটা বন্ধ হয়ে গেছে। এত খাটাখাটনি করে, "ঢাকা শহরের ভ্রাম্যমান পাগল" নিয়ে যে লেখাটা সে লিখেছে তা কোথাও ছাপা হয়নি। ঘরে পড়ে আছে। ভাইয়া কাজ জুটানোর জন্যে খুব ছোটাছুটি করছে, লাভ হচ্ছে না।

আমি দুলু আপার কাছ থেকে প্রথমে তিনশ পরে দুশ টাকা এনেছি। সেই টাকাও শেষ। চরম দুঃসময়েও আমরা খুব স্বাভাবিক থাকতে পারি, এখন তাই আছি। ভাইয়া আগের মতই হাসি তামাশা করছে। সেদিন ভাত খাবার সময় বলল, ঢাকা শহরে সবচে' সুখে কারা বাস করে জানিস খুকী? ঢাকা শহরে সবচে' সুখে আছে — ভ্রাম্যমান পাগলের দল।

'কেন?'

'এদের রোজগার খুব ভাল। যার কাছেই টাকা চায় সেই ভয়ে অস্থির হয়ে টাকা দিয়ে দেয়। পাগল মানুষ, কি করে ঠিক নেই তো। যে কোন রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ালে রেস্টুরেন্টের মালিক কিছু একটা খাবার হাতে ধরিয়ে দেয় যাতে তাড়াতাড়ি বিদেয় হয়। পুলিশ এদের কিছু বলে না। তাদের আছে পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।'

আপা বলল, ভিক্ষা না করে লোকজন পাগল সাজলেই পারে।

'তা পারে। তবে পাগল সাজা খুব সহজ কাজ না। কঠিন কাজ। বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ব্যাপার আছে। পাগল হিসেবে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করার প্রথম শর্ত হচ্ছে সব কাপড় চোপড় খুলে ফেলতে হবে। যাতে দেখামাত্র লোকজন বুঝতে

পারে এ পাগল। ঢাকা শহরের ভ্রাম্যমান পাগলদের শতকরা ৭০ ভাগ হল দিগম্বর। বানিয়ে বলছি না। হিসাব করে বলছি।'

আমি বললাম, এর মধ্যে নকল পাগল নেই?

'আছে। বেশ কয়েকটা নকল পাগল আছে। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে পাগলামীর অভিনয় করতে করতে অল্পদিনের মধ্যে এরা পাগল হয়ে যায়। এটা বেশ স্ট্রেঞ্জ একটা ব্যাপার।'

'তুমি দেখি ভাইয়া পাগল বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছ।'

'তা হয়েছি। বেশ কয়েকটা পাগলের সঙ্গে আমরা খাতিরও হয়েছে। শিক্ষা ভবনের সামনে ছালা গায়ে একটা পাগল বসে থাকে, আমাকে দেখলেই দৌড়ে এসে হাত ধরে টানতে টানতে চায়ের দোকানে নিয়ে যাবে। চা খাওয়াবে। সিগারেট খাওয়াবে।'

'আসল পাগল না নকল?'

'ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট খাঁটি পাগল। এর বাবা এডভোকেট, ভাই বোন আছে। এক বোন গ্রীনলেজ ব্যাংকের ম্যানেজার।'

'এইসব জানলে কোত্থেকে? পাগল তোমাকে বলেছে?'

'আরে না। পাগল কোন কথা বলে না। খালি হাসে। এর নাম আমি দিয়েছি হাস্যমুখী। এইসব তথ্য আমি জেনেছি যেখানে চা খাই সেই দোকানের মালিকের কাছ থেকে। পাগলের বাবা ঐ দোকানে খাতা খুলে দিয়েছে। ছেলে যত কাপ চা খায় হিসাব থাকে। মাসের শেষে টাকা দিয়ে যান।'

'আমি বললাম, ওদের সঙ্গে এত ঘোরাঘুরি করো না তো ভাইয়া। শেষে তুমি নিজেও পাগল হয়ে যাবে।'

'পাগল হইনি তোকে বলল কে? গভীর রাতে তোরা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়িস তখন হা-হা করে আমি পাগলের মত হাসি।'

আমি বললাম, পাগলরা হা হা করে হাসে না।

ভাইয়া অবাক হয়ে বলল, দ্যাটস কারেক্ট। পাগলরা আসলেই হা হা করে হাসে না। অথচ আমরা কথায় কথায় বলি, পাগলের মত হা হা করে হাসছে। ওরা চিৎকার করে কাঁদেও না। আমার ধারণা কি জানিস যে মানুষ যত সুস্থ সে তত শব্দ করে হাসে, এবং কাঁদে।

আমি বললাম, অন্য কোন আলাপ কর তো ভাইয়া। এই প্রসঙ্গ আমার ভাল লাগছে না। প্রসঙ্গ পাল্টাও।

'পাল্টাচ্ছি। তুই কি তোর দুলুনী আপার কাছে থেকে আমাকে তিনশ' টাকা

এনে দিতে পারবি?'

'পারব।'

'আমার কথা বলবি না।'

'তোমার কথা বললে অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা আছে। তুই বলবি তোর নিজের দরকার।'

আমি টাকা আনতে গেলাম। কার দরকার কিছুই বলতে হল না। দুলু আপা ড্রয়ার থেকে টাকা বের করতে করতে বললেন, রেনু তোদের কি খুব অসুবিধা যাচ্ছে?

আমি বললাম, হুঁ। তবে সাময়িক। বাবার একটা বড় বিল আটকে আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

'ও আচ্ছা।'

'ভাইয়া যদি একটু সংসারী হত তাহলে কোন সমস্যাই হত না। সে একবার বিদেশী কোম্পানীর চাকরির অফার পেয়েছিল। বেতন শুনে তুমি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

'কত বেতন?'

'কুড়ি। টুয়েন্টি থাউজেন্ড।'

'বলিস কি?'

'ভাইয়া রাজি হল না। বলে দূর দূর —।'

'দূর দূর বলল কেন?'

'জাহাজের চাকরি তো। জাহাজে জাহাজে থাকতে হয়। ভাইয়ার পছন্দ না।'

দুলু আপা মৃদু স্বরে বললেন, জাহাজের চাকরি তো খুব ইন্টারেস্টিং হওয়ার কথা। সব সময় পানির উপর থাকা। চাকরিটা নিলেই পারত।

'আমরা অনেক বুঝিয়েছি। ভাইয়া রাজি হয়নি।'

কথাবার্তা চালিয়ে যেতে আমার অস্বস্তি লাগছে। যা বলছি সবই মিথ্যা। কে ভাইয়াকে কুড়ি হাজার টাকার চাকরি দেবে? টাকা তো এত সস্তা এখনো হয় নি।

মিথ্যা কথা বলার আমার এই বিশ্রী স্বভাবটার কথা কি আপনাকে বলেছি? বলেছি বোধ হয়। মিথ্যা বলতে আমার খুব যে ভাল লাগে তা না তবু হঠাৎ হঠাৎ বলতে হয়। দুলু আপার সঙ্গে যখন মিথ্যা বলি তখন সত্যি খুব খারাপ লাগে।

এই যেমন এখন লাগছে। ইচ্ছা করছে তাঁর হাত ধরে বলি — আপা যা বলেছি সব কিছু মিথ্যা। কিছু মনে করো না।

দুলু আপা বলল, বাদামের সরবত খাবি?

'বাদামের আবার সরবত হয় না–কি?'

'হয়। পেস্তা বাদাম হামা দিস্তায় পিষে সরবত বানায়।'

'সেই সব সরবত তো পালোয়ানরা খায় বলে জানি।'

'খেয়ে দেখ্, খেতে খুব ভাল।'

'না আপা সরবত খাব না। এখন যাব।'

দুলু আপা অন্যমনস্ক গলায় বলল, আচ্ছা শোন, তোর ভাইয়া মাঝে মাঝে গভীর রাতে এমন হা হা করে হাসে কেন?

'জানি না কেন? মনে হয় পাগল হওয়ার চেষ্টা করছে।'

দুলু আপা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শান্ত স্বরে বললেন, পাগল হবার চেষ্টা করছে মানে?

'ঠাট্টা করছি আপা।'

'না, তুই ঠাট্টা করছিস না — ব্যাপারটা কি বল তো?

'ব্যাপার কিছু না। ভাইয়া পাগলদের উপর গবেষণা করছে তো। কাজেই মাঝে মাঝে পাগলের মত আচরণ করে। হা হা করে হাসে। তবে আপা হা হা করে হাসি কিন্তু পাগলের লক্ষণ না। পাগলেরা হা হা করে হাসতে পারে না।'

'কে বলল?'

'ভাইয়া বলেছে।'

দুলু আপা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন — ঐ দিন তোর ভাইয়াকে রাস্তায় দেখলাম। সঙ্গে রোগামত একটি মেয়ে। দু'জন খুব হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করছে। ঐ মেয়েটা কে?

'খুব সম্ভব আভা। সেও একজন পাগল বিশেষজ্ঞ। ওরা দু'জন মিলে পাগল খুঁজে বেড়ায়।'

'কি যে কথা তুই বলিস না রেনু। তুই কি সব সময় এমন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলিস?'

আমি কিছু বললাম না। ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলাম। এমন হাসি যার অনেক রকম অর্থ হতে পারে। দুলু আপা বললেন, তোরা তিন ভাইবোন সম্পূর্ণ তিন রকম। কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই।

'উঠি আপা?'

'না না বোস। আরেকটু বোস। পা উঠিয়ে আরাম করে বোস। তুই এসেই শুধু যাই যাই করিস কেন?'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আজ আর যাব না। থাকব তোমার এখানে। রাতে

ঘুমাব।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'তাহলে আয় ছাদে পাটি পেতে সারারাত কাটিয়ে দি। বৃষ্টির মধ্যে পাটি পেতে শুয়ে দেখেছিস? দারুন ইন্টারেস্টিং। শুদু বাতাস যখন বয় তখন খুব ঠাণ্ডা লাগে।'

আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, তুমি কিন্তু আপা একজন গ শ্রেণীর পাগল।

'গ শ্রেণীর পাগল মানে?'

'তিন ক্যাটাগরীর পাগল আছে। ক, খ ও গ। তুমি গ ক্যাটাগরী।'

'কি সব উদ্ভট তোর কথাবার্তা। অন্য গল্প কর।'

'অন্য কি গল্প?'

'ঐ মেয়েটির কথা বল।'

'কোন মেয়েটির কথা?'

'আভা।'

'আভার কথা কি বলব?'

'যা জানিস সব বলবি।'

'আমি কিছুই জানি না। ঐ মেয়েটিকে কখনো দেখিনি।'

'সে কি?'

'সত্যি দেখিনি। এ বাড়িতে কখনো আসে নি।'

দুলু আপা আগ্রহ নিয়ে বললেন, এলে তুই কি আমাকে খবর দিবি?

'হুঁ দেব।'

'অনেষ্ট!'

'অনেষ্ট।'

আভার সঙ্গে দেখা হল পরদিন। দুপুর বেলা দরজা খট খট করছে। আমি দরজা খুলতেই রোগামত মেয়েটি বলল, রেনু ভাল আছ? শুরুতেই মেয়েটা আমাকে খানিকটা হকচকিয়ে দিল। হয়ত ইচ্ছা করেই দিল। মানুষকে হকচকিয়ে দিতে সবাই পছন্দ করে। আমি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললাম, আমি ভাল আছি।

'তুমি কি আমাকে চেন?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, না। যদিও আমি তাঁকে খুব ভাল করেই চিনেছি। রোদে ঘুরে মুখ লাল টকটকে হয়ে আছে। মাথার চুল উড়ছে। কপালে

বিন্দু বিন্দু ঘাম। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণার্ত মানুষের ঠোঁট শুকিয়ে থাকে।

'রঞ্জু কি ঘরে আছে?'

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এই মেয়ে ভাইয়ার চেয়ে খুব কম করে হলেও চার পাঁচ বছরের ছোট। অথচ কত অবলীলায় বলছে, রঞ্জু কি ঘরে আছে?

আমি শুকনো গলায় বললাম, না।

'আমাকে একটা জিনিস দেবার কথা। তোমাকে কিছু বলে যায় নি?'

'না তো।'

'আমি খানিকক্ষণ বসি?'

'বসুন।'

আমি তাঁকে ভাইয়ার ঘরে নিয়ে গেলাম। আভা বিছানায় বসতে বসতে বলল, তুমি আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াও। ঠাণ্ডা পানি। তোমাদের বাসায় কি ফ্রীজ আছে?

' না, ফ্রীজ নেই।'

'দুলুদের বাসায় নিশ্চয়ই আছে। ওদের কাছ কাছ থেকে ঠাণ্ডা এক বোতল পানি এনে দেবে? তৃষ্ণায় আমার সমস্ত শরীর শুকিয়ে গেছে। খুব ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছে করছে।'

আমি পানি আনতে গেলাম। এক সঙ্গে দু'টি কাজ হবে। দুলু আপাকেও বলা হবে — আভা এসেছে। আভার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কথা বলতে পারবেন।

দুলু আপা বাসায় ছিলেন না। তাঁর নানুর বাড়ি গিয়েছেন। সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না। আমি পানির বোতল নিয়ে ফিরে এসে দেখি ভাইয়ার টেবিল থেকে একটা পেপারওয়েট নিয়ে আভা তার স্যাণ্ডেলে কি যেন ঠুকঠাক করছে। আমাকে দেখে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল — পেরেক উঁচু হয়ে আছে? পা কেটে রক্তারক্তি। আজকাল কোন স্যাণ্ডেলে পেরেক থাকে না। গাম দিয়ে জোড়া লাগানো হয়। আমার ভাগে কি করে যেন পড়ল পেরেক লাগানো স্যাণ্ডেল।

'নিন, পানি নিন।'

'টেবিলের উপর রাখ। তোমাদের বাসায় লোকজন নেই? খালি খালি লাগছে।'

'না। আমি একাই আছি।'

'বাকিরা কোথায়?'

'এক বিয়েতে গেছেন?'

'কার বিয়ে?'

আমি নিতান্তই বিরক্তি বোধ করছি। কার বিয়ে তা দিয়ে উনার প্রয়োজনটা কি? আমি বললাম, যার বিয়ে তাকে আপনি চিনবেন না।

'আমি তোমাদের সব আত্মীয়-স্বজনকে চিনি। রঞ্জু আমাকে বলেছে।'

'বললামতো তাকে আপানি চিনবেন না। সে আমাদের কোন আত্মীয় নয় — আপার বান্ধবী। আপা একা কোথাও যায় না বলেই মা'কে নিয়ে গেছে।

আভা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, মীরার বান্ধবী? ইয়াসমিনের কথা বলছ? যার এক ভাই জাপান এম্বেসীর ফার্স্ট সেক্রেটারী?

আমি শুকনো গলায় বললাম, হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন।

'রঞ্জু আর আমি কিছুদিন দীর্ঘ সময় এক সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছি — তখন কথা হয়েছে। আমি বললাম না — তোমাদের সব কথা জানি। তুমি তো আমার কথা বিশ্বাস করনি।'

'এখন করছি। আপনি কিন্তু পানি খান নি।'

'খাব। আচ্ছা শোন রেনু, তুমি কি আমাকে বিসকিট বা এই জাতীয় কিছু দিতে পারবে? ঘরে আছে? সারাদিন কিছু খাইনি তো। সেই ভোর সাতটায় দু'কাপ চা আর একটা টোস্ট বিসকিট খেয়েছি। এখন বাজে দু'টা। সাত ঘণ্টা। খালি পেটে চা খেলে কি হবে জান? হড় হড় করে সব বমি হয়ে যাবে।'

'আপনি কি ভাত খাবেন? আমি এখনো খাইনি, আমার সঙ্গে খেতে পারেন ।'

'তোমার কম পড়বে না তো আবার?'

'না কম পড়বে না। তবে খাওয়ার তেমন কিছু নেই।'

আভা হাসতে হাসতে বলল, কিচ্ছু লাগবে না। তুমি বোধ হয় জান না আমি শুধু ভাত খেতে পারি। খুব গরম ভাত লবণ ছিটিয়ে খেয়ে দেখো, ইন্টারেস্টিং লাগে। ভাতের আসল স্বাদ পাওয়া যায়। তরকারী দিয়ে খেলে ভাতের আসল স্বাদ পাওয়া যায় না।

'আপনি কি হাত মুখ ধুবেন?'

'হ্যাঁ ধোব। তুমি যদি রাগ না কর তাহলে আমাকে একটা শাড়ি দাও। গোসল করে ফেলি। ঘামে সারা শরীর চটচট করছে। গা না ধুয়ে কিছু খেতে পারব না। আমার কথাবার্তায় তুমি রাগ করছ না তো।'

'না রাগ করছি না।'

'রাগী রাগী চোখে তাকিয়ে আছ কিন্তু।'

'আমার চোখগুলিই ও রকম।'

'তোমার চোখ খুব সুন্দর। আমি মন-রাখা কথা বলি না। সত্যি কথা তোমাকে বললাম।'

নিতান্তই অপরিচিত একটা বাসায় কোন মেয়ে এত সহজ স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। খুব বোকা ধরনের মেয়েরা হয়ত করলেও করতে পারে। কিন্তু আভা বোকা নয়। চালাক মেয়ে।

সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গোসল সারল। চিরুনী দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াতে আচড়াতে বলল — এই বুঝি তোমাদের সেই একের ভেতর দুই আয়না? বা সুন্দর তো!

খেতে বসতে বসতে আমাদের তিনটা বেজে গেল।

আভা খেতে পারল না। অল্প চারটা ভাত মুখে দিয়েই বলল, রেনু, আমি খেতে পারছি না। আমার জ্বর আসছে।

কেউ জ্বর আসছে বললে হাত বাড়িয়ে তার গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করা ভদ্রতা। আমার তা করতে ইচ্ছা করল না। আমি চুপ করে রইলাম। আভা থালা সরিয়ে উঠে পড়ল।

'রেনু, আমি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি?'

'থাকুন।'

'খাওয়া শেষ হলে তুমি আমার গায়ে একটা চাদর টাদর কিছু দিয়ে দিও তো। খুব শীত লাগছে।'

'ঘরে প্যারাসিটামল আছে। খাবেন?'

'না। আমি ট্যাবলেট খেতে পারি না। বমি হয়ে যায়।'

আমি খাওয়া শেষ করে থালা বাসন গুছিয়ে ভাইয়ার ঘরে গিয়ে দেখি — আভা তার পুরানো কাপড়গুলি পরে চুপচাপ বসে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, বাসায় চলে যাব রেনু। জ্বর খুব বাড়বে। আমার মনে হয় এখনি বেড়েছে। দেখ, গায়ে হাত দিয়ে দেখ।

এরপর জ্বর না দেখলে খারাপ দেখায়। আমি গায়ে হাত দিয়ে রীতিমত চমকে উঠলাম। গা পুড়ে যাচ্ছে। এতটা জ্বর নিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কেউ কথা বলছে কি করে কে জানে।

'আপা আপনি শুয়ে থাকুন।'

'পাগল। এখন শুয়ে থাকা যাবে না। শোন রেনু, আমাকে রিকশা ভাড়া দিতে পারবে? এই অবস্থায় হেঁটে যাওয়া সম্ভব না। আমি এসেছিলাম কি জন্যে জান? টাকা ধার করতে। রঞ্জুকে বলেছিলাম শ' তিনেক টাকা জোগাড় করে রাখতে। যার

সঙ্গেই আমার সামান্য পরিচয় হয় তার কাছেই আমি টাকা ধার চাই। কি বিশ্রী অবস্থা। আমি ভেবেছিলাম রঞ্জুর কাছে কোনদিন ধার চাইব না। মানুষ যা ভাবে তা করতে পারে না।'

'ভাইয়া সম্ভবত আপনার জন্য টাকার ব্যবস্থা করেছে।'

'বলেছিল করবে। তোমাকে দিয়ে দুলুর কাছ থেকে আনবে। এই দেখ, তোমাদের সব কথা আমি জানি। রেনু, আমাকে রিকশা ভাড়া দাও। আমি চলে যাই। আর শোন, এই কাগজে আমার বাসার ঠিকানা লিখে দিলাম — রঞ্জুকে দেবে।'

'ভাইয়া তো আপনার বাসা চেনে।'

'এই বাসাটা চেনে না। আমরা বেশী দিন এক বাসায় থাকি না। ভাড়া জমে যায়, তারপর বাসা বদলাই।'

আভা হেসে ফেলল যেন খুব মজার কোন কথা।

আমার কাছে একটা দশ টাকার নোট ছিল। আগামীকাল কলেজে যাবার ভাড়া। নোটটা এনে দিলাম।

আভা বলল, রেনু যাই। রঞ্জুকে কাগজটা দিও।

দুঃখের ব্যাপার কি জানেন? ভাইয়াকে আমি কাগজটা দিতে পারলাম না। টেবিলের উপর বই-চাপা দিয়ে রেখেছিলাম — ভাইয়া বাসায় ফিরলে কাগজটা পেলাম না। পুরো টেবিল দু' তিনবার খোঁজা হল। কাগজ পাওয়া গেল না। ভাইয়া বলল, বাদ দে। আভাই আসবে। আমার সমস্যা আছে। আমি ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারি না। ঠিকানা থাকা না থাকা আমার কাছে একই।

'এত জ্বর নিয়ে গেল তুমি তাকে দেখতে যাবে না?'

'ঠিকানা নাই, যাব কি করে? টাকাটা খামে ভরে তোর কাছে দিয়ে দিচ্ছি। এর পর যখন আভা আসবে তাকে দিয়ে দিবি। ও কালই আসবে।'

'উনি কাল আসবেন না। তুমি যদি না যাও উনি আসবেন না।'

'কে বলল তোকে?'

'আমি জানি।'

'তোদের বয়েসী মেয়েদের সবচে' বড় সমস্যা কি জানিস? তোদের বয়েসী মেয়েরা মনে করে তারা পৃথিবীর সব কিছুই জানে। আসলে কিছুই জানে না। আভা কালই আসবে। দশ টাকা বাজি।'

আন্ডা এল না। এক মাস পার হয়ে গেল — তারপরেও না। ভাইয়া পুরানো বাড়িওয়ালার কাছে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। সে রেগে ভূত হয়ে আছে। ভাইয়াকে এই মারেতো সেই মারে অবস্থা।

'এই মেয়ে কি আপনার আত্মীয়? স্ট্রেট জবাব দেন। ভয়ংকর মেয়ে — রাত আটটার সময় আমাকে বলল, চাচা কাল দুপুরে বারটার মধ্যে চারমাসের ভাড়া দিয়ে দেব। খুব লজ্জিত, এত দেরী করলাম। বেশ কিছু টাকা পেয়েছি। চেক। ব্যাংকে জমা দিয়েছি। কাল ক্যাশ হবে। প্রথম টাকাটা তুলেই আপনাকে দেব।

আমি বললাম, ভাল কথা। তারপর মেয়েকে চা-টা খাওয়ালাম। সে হাসি মুখে খাওয়া-দাওয়া করল। আমার ছেলে ভিডিও ক্লাব থেকে উত্তম-সুচিত্রার পুরানো বাংলা ছবি এনেছে। মেয়ে বলল, ছবিটা এখন দিও না। একটু পরে দাও। আমিও দেখব।

আমার ছেলে বলল, আচ্ছা। তারপর মেয়ে করল কি সবাইকে নিয়ে বেবী টেক্সি করে বিদায়। ঘরবাড়ি খা খা করছে। বিছানা বালিশ সব আগেই সরিয়েছে। একটা একটা করে সরিয়েছে। কিছু টের পাই নাই।

অনেক মেয়ে দেখেছি জীবনে। এমন মেয়ে কিন্তু দেখি নাই। এখন আপনি বলেন — তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি।

'কোন সম্পর্ক নেই।'

'সম্পর্ক নেই বললে তো হবে না। আপনি জোয়ান ছেলে আর সেও সুন্দরী মেয়ে। সম্পর্ক আছেই — তবে সাবধান করে দিচ্ছি। চার নম্বর দূরবর্তী বিপদ সংকেত। যত দূরে থাকবেন — তত ভাল থাকবেন। বৃদ্ধ মানুষের এই উপদেশ মনে রাখবেন।'

৪

দেড়মাস পার হল বাবা ফিরলেন না। এর আগে কখনো এতদিন বাইরে থাকেন নি। পনেরো দিন আগে মনি অর্ডারে তের শ' টাকা পাঠিয়েছেন। কুপনে গুড়ি গুড়ি অক্ষরে লেখা —

"পর সমাচার, আমি ভাল আছি। দেশের সামগ্রিক অবস্থা খারাপ। কাজেই ব্যবসা বাণিজ্যও খারাপ। কি করিব বুঝিতে পারিতেছিনা। জ্বর জ্বারিতে কিঞ্চিৎ কাবু হইয়াছি। তবে বর্তমানে সুস্থ। খাওয়া দাওয়া নিয়মিত করিতেছি। শিগ্‌গীরই আসিতেছি।"

কুপনের লেখা দেখে আমরা খুব চিন্তিত বোধ করলাম। কারণ কুপনের লেখাটা বাবার হাতের না। অন্য কেউ লিখে দিয়েছে। এরকম কখনো হয় না। মা বললেন, কে লিখে দিল রে।

ভাইয়া বলল — অশনি সংকেত।

মা বললেন, অশনি সংকেত কি?

'মেয়ে ছেলের হাতের লেখা বলে মনে হচ্ছে।'

ভাইয়ার এই রসিকতা মাঠে মারা গেল। মা খানিকক্ষণ কঠিন চোখে তাকিয়ে থেকে — দ্রুত চলে গেলেন।

ভাইয়া হো হো করে খানিকক্ষণ হাসল। আমরা কেউ ভাইয়ার হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। আপা বিরক্ত হয়ে ধমক দিল — চুপ কর তো ভাইয়া।

রাতে মা'র সঙ্গে ঘুমুচ্ছি। মা বললেন, মানি অর্ডারের লেখাটা কি মেয়ের হাতের?

আমি বললাম, মেয়ের হাতের লেখা আবার কি? মেয়েদের কি কোন আলাদা লেখা হয়? ছেলেরা যেমন লেখে মেয়েরাও তেমনই লেখে। মা শুকনো ভাবে বললেন, ও।

'তুমি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাব না-কি মা?'

' না ভাবি না।'

'বাবা কয়েক দিনের মধ্যেই চলে আসবেন। তোমার মন থেকে তখন সব

দুঃশ্চিন্তা দূর হবে। বাবাকে আটকে রেখ। তাকে আর বাইরে বেরুতে দিও না।'

'ও বেশীদিন ঘরে থাকতে পারে না।'

'এইবার কঠিন শাসনে বেঁধে রাখবে। দরকার হলে তালা বন্ধ করে রাখবে। পারবে না?'

মা চুপ করে রইলেন।

আমি মা'র গায়ে হাত রেখে বললাম, আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর বাবা ফিরে আসবে মা। আটচল্লিশ ঘণ্টা।

মা শুকনো গলায় বললেন, ফিরে এলে তো ভালই।

বাবা ফিরে এলেন না। আরো পনেরো দিন কেটে গেল। মা'র দিকে তাকিয়ে আমরা এমন ভাব করতে লাগলাম যেন এটা কিছুই না। বাবার দীর্ঘদিন না ফেরাটা যেন খুব স্বাভাবিক।

লেখকরা না-কি অনেক কিছু বুঝতে পারেন?

আপনি কি পারেন? আপনি কি আমাকে দেখে বলতে পারবেন আমি সুখে আছি না কষ্টে আছি? আমার কিন্তু মনে হয় না। এখন যদি আমি আপনাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই আপনি ভাববেন — বাহ্ সুখী পরিবার তো হাসাহাসি গল্পগুজব হচ্ছে। কে বলবে আমাদের কোন সমস্যা আছে? ভাইয়া এক জাপানী শেখার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। নিয়মিত ক্লাস করছে। জাপানী ভাষা যা শিখে আসছে — আমাদেরও শেখাচ্ছে। যেমন আজ গরম . কিনোও ওয়া আৎসুই দেসু। গতকালও গরম ছিল : কিনোও মো আৎসুকাত্তয়া দেসু। অনেক দিন পর আপনাকে দেখতে পাচ্ছি : ইয়াআ শিবারাবু।

ভাইয়া যা শিখে আসছে আমিও সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে সব শিখে নিচ্ছি। খাবার টেবিলে দু'জন গম্ভীর ভঙ্গিতে জাপানীতে কথা বলি। অথচ আড়াই মাস হয়ে গেল — বাবার খোঁজ নেই, তিনি কোথায় আছেন কিছুই জানি না। দুপুরবেলা আমরা সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকি — কারণ ঠিক দুপুরে পিয়ন আসে। পিওন আসে এবং চলে যায়। চিঠি আসে না। আমাদের উৎকণ্ঠা কাটে না। হয়ত টেলিগ্রাম আসবে। টেলিগ্রাম পিয়ন তো যে কোন সময় আসতে পারে।

আমরা সবাই যে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা এবং অনিশ্চতায় বাস করছি তা একজন অন্যজনকে বুঝতে দেই না। সংসার একেবারে অচল অবস্থায় এসে ঠেকেছে। ঠিকা ঝি নেই। ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম মা এবং আপা করছেন। আপাই বেশী করছে। মা'র শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। তিনি তেমন কিছু করতে পারেন না।

বেশীরভাগ সময় বারান্দায় বসে থাকেন।

সংসার এখনো কি করে চলছে আমি জানি না। দু'বেলা রান্না হচ্ছে তা দেখছি। দুঃসময়ের জন্যে মা'র নানা রকম গোপন সঞ্চয় আছে। একে একে সেইসব সঞ্চয় ব্যবহৃত হচ্ছে। তাও নিশ্চয়ই শেষের দিকে। গত সপ্তাহে প্রথমবারের মত কলেজে যাবার আগে আগে মা বললেন, বাদ দে, কলেজে যেতে হবে না।

আমি বললাম, কেন যেতে হবে না মা?

মা চুপ করে রইলেন।

'রিকশা ভাড়া দিতে পারবে না — তাই না?'

'হুঁ।'

'হেঁটে যাব। তোমাকে রিকশা ভাড়া দিতে হবে না।'

বাসা থেকে বই খাতা নিয়ে আমি বের হই — বেশীরভাগ দিনই কলেজে যাই না। রাস্তায় রাস্তায় হাঁটি। কেন হাঁটি বলুন তো? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন আমি বাবাকে খুঁজি। প্রতিদিনই মনে হয় আজ হয়ত পাব। হঠাৎ দেখব রাস্তার মোড়ে কোন চায়ের দোকানে বসে বাবা চা খাচ্ছেন — হাতে খবরের কাগজ। বাবাকে দেখে প্রচণ্ড চিৎকার দিতে গিয়েও আমি দিলাম না। নিজেকে সামলে নিয়ে চুপিচুপি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। কানের কাছে মুখ নিয়ে নীচু গলায় গানের মত সুরে বললাম, বাবা!

তিনি চমকে তাকালেন। অবাক হয়ে বললেন, আরে খুকি, তুই এখানে কোত্থেকে?

আমি বললাম, আগে বল তুমি এখানে কি করছ?

'চা খাচ্ছি।'

'আমরা চিন্তায় মরে যাচ্ছি, আর তুমি আরাম করে চা খাচ্ছ?'

'চিন্তায় মরে যাচ্ছিস কেন?'

'আনাতা মো ইশশোনি ইকিমাসেন কা!'

'ইকড়ি মিকিড়ি করছিস কেন?'

'ইকড়ি মিকিড়ি না এটা হচ্ছে জাপানী ভাষা।'

'জাপানী বলছিস কেন ?'

'বাসার সিস্টেম বদলে গেছে বাবা। বাসায় কথাবার্তা সব হয় জাপানীতে।'

'বলিস কি?'

'তোমাকেও জাপানী শিখতে হবে নয়ত কথাবার্তা বলতে পারবে না।'

'এতো আরেক যন্ত্রণা হল দেখি।'

বাবার সঙ্গে দেখা হলে প্রথম কথা কি বলব তা ভেবে ভেবে পথ হাঁটতে ভাল লাগে। বাসায় ফিরি ক্লান্ত হয়ে কিন্তু এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে। মনে হয় বাসায় পা দিয়েই দেখব — বাবা এসেছেন। চুলে কলপ দিয়ে যুবক সাজার হাস্যকর প্রচেষ্টা যথারীতি করেছেন। দাঁতও ওয়াশ করা হয়েছে। মা'র জন্যে অতি বদরঙা শাড়িও আনা হয়েছে। বারান্দার মোড়ায় বসে পা দোলাতে দোলাতে চা খাচ্ছেন। কাছেই বাজারের ব্যাগ। চা শেষ করে চলে যাবেন মাছের মাথা কিনতে। সবচে' পচা মাথাটা কিনে হাসি মুখে ফিরবেন। রান্নার সময় মা'র পাশে বসে ডিরেকশন দেবেন — দু'টা কাঁচা মরিচ ছেড়ে দাওতো। আর এক চিমটি পাঁচ ফোড়ন।'

তিনমাস পার হবার পর আমরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলাম। ছবিসহ বিজ্ঞাপন। ভাইয়া থানায় গিয়ে জিডি এন্ট্রি করাল। ওসি সাহেব বললেন, উনার কি কোন শত্রু আছে?

ভাইয়া দুঃখিত গলায় বলল, শত্রু থাকবে কেন?

ওসি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, মহাপুরুষদেরও তো শত্রু থাকে ভাই। গান্ধিজীকেও আততায়ীর হাতে মরতে হয়েছিল।

'মৃত্যুর কথা বলছেন কেন?'

'কথার কথা বলছি। তবু পসিবিলিটি কিছু থাকেই। আপনি বলছেন ব্যবসায়ের কারণে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় — ধরুন কোন হোটেলে হার্ট এ্যাটাক হল। কেউ জানে না এই লোক কে? তখন একদিন অপেক্ষা করে সাধারণত মাটি দিয়ে দেয়।'

'বলেন কি?'

'আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষ কখনো পকেটে ঠিকানা নিয়ে ঘুরে না। আপনি দিন সাতেক পরে আসুন। এ জাতীয় কেইস থানায় রিপোর্টেড হয়। খবর বের করে রাখব। ঘাবড়াবেন না।'

'ঘাবড়াচ্ছি না।'

শুধু ভাইয়া না, আমরা কেউ ঘাবড়াচ্ছি না। অন্তত আমাদের দেখে কেউ বলবে না আমরা ভেঙ্গে পড়েছি। শুধু একটু বেশী হাসাহাসি করছি। আগের চেয়ে শব্দ করে কথা বলছি। রাত একটা দু'টা পর্যন্ত জেগে বসে থাকছি। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলে এক সঙ্গে দু' তিন জন ছুটে যাচ্ছি।

আমার ধারণা ছিল, পত্রিকায় ছবি বের হবার পর অনেকেই আমাদের বাসায় আসবে। বাবার বন্ধুরা যাঁরা তাঁর সঙ্গে ব্যবসা করেন। যাদের সঙ্গে কর্মসূত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। আশ্চর্য! কেউ এল না। তাহলে ব্যাপার কি এই দাঁড়াচ্ছে যে

তাঁর কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না? মিত্রহীন একজন মানুষ এই শহরে দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়িয়েছে?

সুলায়মান চাচা একদিন বললেন, রেনু তোর বাবার একটা ছবি আমাকে দিস তো?

'ছবি দিয়ে কি হবে চাচা?'

'চকবাজারে যাব। ছোট ব্যবসায়ীরা সবাই কোন না কোনভাবে চকবাজারের সঙ্গে যুক্ত। ওদের ছবি দেখালে চিনতে পারে।'

'আমাকে সঙ্গে নেবেন চাচা?'

'আচ্ছা নেব। শরীরটা একটু ঠিক হোক তারপরই . . .'

সুলায়মান চাচার শরীর খুবই খারাপ করেছে। বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে যাওয়াও নিষিদ্ধ। সেবার জন্যে তাঁর তিন মেয়েই এসেছিল। তাদের তিনি হাঁকিয়ে দিয়েছেন। ভাইয়াকে বলেছেন, এরা স্বামীর পরামর্শে আমাকে খুন করবে। মুখে বালিশ চেপে ধরবে। তিনজন এক সঙ্গে বালিশ চেপে ধরলে আর দেখতে হবে না।

ভাইয়া বলল, চাচা আপনার নিজের মেয়ে। এসব কি বলছেন?

সুলায়মান চাচা বললেন, এরা এখন আর মেয়ে না — এরা স্বামীর হাতের রোবট। স্বামীরা বোতাম টিপে এদের কন্ট্রোল করছে। হাসতে বললে হাসে, কাঁদতে বললে কাঁদে। এখন ওরা হা করে বসে আছে — কখন মরব। রোজ খোঁজ নিতে আসে অবস্থা কি? আর কত দেরী।

ভাইয়া বলল, উনারা ভাল মনেই আসেন।

'মোটেই ভাল মনে আসে না। আমি মুখ দেখেই বুঝতে পারি। ওরা যখন দেখে আমার শরীর একটু ভাল তখন মুখ লম্বা করে ফেলে। সে একটা দেখার মত দৃশ্য। তবে ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে — এমন প্যাঁচ দেব — বুঝবে ঠ্যালা।'

'কি ঠ্যালা?'

'মেজো মেয়েকে সব জমিজমা দানপত্র করে যাব। ঐ মেয়েটাই সবচে' বদ। তখন খেলা জমে যাবে। বাকি দুইজন তাকে ছিড়ে ফেলবে। সম্পত্তি নিয়ে কামড়া-কামড়ি শুরু হবে। তিন জামাই যে 'থ্রী কমরেডস' হয়েছে কমরেডশীপ বের হয়ে যাবে। শুরু হবে সাপে নেউলে — হা হা হা।'

'প্ল্যান খারাপ না চাচা।'

'অনেক চিন্তা ভাবনা করে প্ল্যান বের করা। প্ল্যান খারাপ হবে কেন? তোর বাবার সন্ধান বের করার জন্যেও প্ল্যান করছি। সারাদিন তো বাসায় শুয়েই থাকি। শুয়ে শুয়ে ভাবি।'

'পেয়েছেন কিছু?'

'এখনো কংক্রিট কিছু পাই নি। তবে সব রকম চেষ্টা চালাতে হবে। ভৌতিক, আধিভৌতিক। দরকার হলে জ্বীনের সাহায্য নিতে হবে। ছোটবেলায় দেখেছি কেউ হারিয়ে গেলে জ্বীন নামানো হত।'

আমি হেসে ফেললাম। সুলায়মান চাচা বিরক্ত গলায় বললেন, এই মেয়ে হাসে কেন? জগতে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার হয়। বুঝলি মেয়ে — সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিতে নাই। জ্বীন, পরী সবই আছে ।. . .

আমি বললাম, একবার জ্বীন নিয়ে আসুন চাচা। আমার জ্বীন দেখার খুব শখ।

'দেখি পাওয়া যায় কি–না। এই লাইনে ওস্তাদ লোকজন পাওয়াই মুশকিল। চর্চা নাই। দু' একজনকে বলেছি — ওরা চেষ্টা চরিত্র করছে।'

আমরা উঠে আসার আগে সুলায়মান চাচা নীচু গলায় বললেন, রঞ্জু শোন, টাকা পয়সা লাগবে?

ভাইয়া বলল, না।

'চালাচ্ছ কিভাবে?'

'চালাচ্ছি না। চাকা আপনা আপনি ঘুরছে।'

'করছ কিছু?'

'বাংলা বাজারে বইয়ের প্রুফ দেখছি। নতুন একটা পত্রিকা বের হয়েছে তার সঙ্গেও আছি। দু' হাজার করে দিবে বলছে — দেখি।'

'চাকরি বাকরির চেষ্টা কিছু করছ না?'

'না।'

'না — কেন?'

'কোন লাভ নেই খামাখা পরিশ্রম।'

'ব্যারিস্টার সাহেবকে বলে দেখলে হয় না? উনার সঙ্গে তো তোমার খুব খাতির। খাতির আছে না এখনো?'

'আছে।'

'তাহলে বল উনাকে।'

'বলব, আগে মন্ত্রী হোক। শোনা যাচ্ছে মন্ত্রী হতে বেশী দেরী নেই। মন্ত্রী হলে ধরব। উনার মন্ত্রী হবার জন্য আমি দিনরাত দোয়া করছি। ভাবছি একটা খতম পড়াব। খতমে ইউনুস।'

এক সন্ধ্যায় সুলায়মান চাচা খবর পাঠিয়ে আমাকে এবং ভাইয়াকে নিয়ে

গেলেন। তাঁর ঘরে রোগা লম্বা এক লোক বসে আছে। ছোট ছোট চোখ, গায়ে কটকটা হলুদ রঙের পাঞ্জাবী। সুলায়মান চাচা গলা খাকড়ি দিয়ে বললেন, উনাকে খবর দিয়ে এনেছি। উনি হচ্ছেন একজন গণক। নিখোঁজ লোকের সন্ধান দিতে পারেন। খুব নাম ডাক আছে।

ডুবন্ত মানুষ খড়কুটা আঁকড়ে ধরে। হলুদ পাঞ্জাবী গায়ে এই লোককে খড়কুটারও অধম লাগছে। একে আকড়ে ধরার কোন মানে হয় না।

ভাইয়া বলল, জনাব আপনার নাম?

এমন ভঙ্গিতে জনাব বলল যেন সে নাটোরের মহারাজাকে সম্বোধন করছে। ঐ লোকও খানিকটা ঘাবড়ে গেল। নীচু গলায় বলল, আমার নাম আবদুর রহমান।

'আবদুর রহমান সাহেব, নিখোঁজ লোক খুঁজে বের করাই কি আপনার একমাত্র পেশা না অন্য কিছুও করেন?'

'সাইড ব্যবসা আছে।'

'মূল ব্যবসা লোক খোঁজা? কিভাবে খুঁজেন — মন্ত্র আছে?'

'মন্ত্র না। আল্লাহ্ পাকের পাক কালাম।'

'কত টাকা নেন এর জন্যে?'

'কনট্রাক্টে কাজ করি। কাজ সমাধা হইলে টেকা নেই। লোক বুঝে নেই। পঞ্চাশ টাকাও নেই আবার ধরেন, দশ হাজারও নেই।'

'দশ হাজার কেউ দিয়েছে?'

'জ্বি দিয়েছে। এক ব্যবসায়ীর ক্লাস টুতে পড়ে ছেলে হারায়ে গিয়েছিল — গণে বের করলাম।'

'বলেন কি?'

'কথা বিশ্বাস না করলে সার্টিফিকেট দেখেন।'

'ম্যারহাবা আপনার সার্টিফিকেটও আছে?'

সুলায়মান চাচা বিরক্ত হয়ে বললেন, খামাখা এত কথা বলছ কেন রঞ্জু? ও বলছে কনট্রাক্টে কাজ করবে তাই করুক। যদি সন্ধান দিতে পারে আমরা তাকে পাঁচশ' টাকা দেব।

ভাইয়া উদাস গলায় বলল, ঠিক আছে দেব।

ভদ্রলোককে বাবার নাম, দাদার নাম দেয়া হল। বাবার ব্যবহারী একটা সার্ট দেয়া হল। সেই সার্ট মাথায় জড়িয়ে সে চোখ বন্ধ অবস্থায় গুন গুন করে খানিকক্ষণ কি যেন পড়ল। চোখ খুলে খুবই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, উনি রওনা হয়ে গেছেন। এখন আছেন মোটরে। চলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখলাম। শরীর ভাল

আছে। তবে একটু কফ হয়েছে।

'ঢাকায় পৌঁছবেন কবে?'

'এক সপ্তাহ লাগবে?'

'মোটরে আসতে এক সপ্তাহ লাগবে? বলেন কি? উনি আছেন কোথায়, দিল্লীতে?'

'তা বলতে পারতেছি না — তবে ঠিক এক সপ্তাহ লাগবে আসতে।'

'উনার গায়ে কি কাপড় দেখলেন?'

'পাঞ্জাবী।'

'শাদা রঙের না খদ্দর?'

'শাদা।'

'আচ্ছা ভাই আরেকজনের সন্ধান দিতে পারেন কি-না দেখেন। এর নাম আভা। এ ঢাকা শহরেই আছে। কোথায় আছে জানি না।'

আবদুর রহমান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, একদিনে দুইজনের কাজ করতে পারি না। এখন যাতায়াত খরচ দেন, চলে যাই। সাতদিন পরে এসে পাঁচশ' টাকা নিয়ে যাব ।

ভদ্রলোককে কুড়ি টাকা যাতায়াত ভাড়া দেয়া হল। সুলায়মান চাচাই দিলেন।

ভাইয়া বলল, এই মক্কেল কোত্থেকে জোগাড় করেছেন চাচা?

'তোমার বিশ্বাস হয় নি, না?'

'আপনার হয়েছে?'

'একেবারে যে অবিশ্বাস হচ্ছে তা না। জগতে অনেক অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে। দেখা যাক না সাতদিন অপেক্ষা করে। ক্ষতি তো কিছু নেই।'

'লোকটা পুরোপুরি বোগাস চাচা — বাবা কখনো পাঞ্জাবী পরেন না। ব্যাটা তাঁকে দেখেছে পাঞ্জাবী পরে বসে আছেন।'

'হয়ত শখ করে পরেছেন। দেখা যাক না। সাতটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

সাতদিন কাটল। অষ্টম দিনে আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম। আমরা কেউ ব্যাপারটা বিশ্বাস করছি না তবু মনে মনে অপেক্ষা করছি। আমাদের মধ্যে সবচে' যে অবিশ্বাসী — ভাইয়া — সে ভোরবেলা বাজার থেকে মাছের মাথা কিনে আনল। দুপুরে আমরা মাথা খেলাম না — অপেক্ষা করে রইলাম রাতের জন্যে। বাবা যদি রাতে আসেন। রাতেও এলেন না। আমরা যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করলাম। ভাইয়া আধুনিক ঈশপের গল্প বলে সবাইকে হাসাল। মাও

হাসলেন।

রাত এগারোটা থেকে বৃষ্টি নামল। মুষলধারে বৃষ্টি। মা আমাকে ডেকে বললেন — রেনু, রঞ্জুকে বল না এক পোয়া চিনি নিয়ে আসতে।

'এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে?'

মা মৃদু গলায় বললেন, লোকটা যদি ভিজতে ভিজতে আসে। এসেই চা খেতে চাইবে। ঘরে একদানা চিনি নেই।

ভাইয়াকে বলতেই সে বৃষ্টি মাথায় করে চিনি আনতে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুলু আপাদের বাড়ির কাজের ছেলেটি এসে আমাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। সেখানে লেখা,

> রেনু, খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ছাদে ভিজতে ইচ্ছা করছে। তুমি আসবে? প্লীজ চলে এসো। আমার মনটা ভাল না।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। মন খারাপের কত তুচ্ছ কারণ থাকে মানুষের। মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছে এই দেখে একজনের মন খারাপ হয়ে গেছে। সে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মন ভাল করার চেষ্টা করবে।

আমি দুলু আপার বাড়িতে গেলাম না। অনেক রাতে ঘুমুতে গিয়ে দেখি মা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পরেছেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় কয়েকবার ডাকলাম — মা সাড়া দিলেন না। যদিও জানি তিনি জেগে আছেন। চলে এলাম ভাইয়ার ঘরে। সেও শোবার জোগাড় করছে।

'তোমার ঘরে শোব ভাইয়া।'

ভাইয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, অনুমতি দেয়া হল। কণ্ডিশান আছে।

'কি কণ্ডিশান?'

'ভোর পাঁচটায় ডেকে দিতে হবে, পারবি?'

'এত ভোরে উঠার তোমার দরকার কি?'

'এক ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে কথা হয়েছে। সে আমাকে বরিশাল নিয়ে যাবে। ট্রাক ছাড়বে ভোর ছটায়।'

'বরিশাল যাবে কেন?'

'একটা কাজ আছে।'

'বাবার কোন খোঁজ পেয়েছ?'

'হুঁ।'

সদরঘাটের এক লোক বলল — দিন দশেক আগে সে বাবাকে দেখেছে। বরিশাল যাবার লঞ্চে উঠছেন।

'দিন দশেক আগে সে বাবাকে ঢাকায় দেখেছে?'

'তাই তো বলল।'

'বাবাকে সে চেনে?'

'ছবি দেখে চিনেছে। নাম জানে না। চেহারায় চেনে।'

'আমাদের তুমি বলনি কেন?'

'লোকটার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি, তাই বলি নি।'

'বিশ্বাস হয় নি কেন?'

'লোকটার চেহারা প্রফেশনাল মিথ্যাবাদীর মত।'

'চেহারা মিথ্যাবাদীদের মত আবার কি?'

'মিথ্যাবাদী লোকদের চেহারায় মিথ্যার ছাপ পড়ে।'

'ও শুধু শুধু মিথ্যা বলবেই বা কেন?'

'প্রফেশনাল মিথ্যাবাদীরা কারণ ছাড়াই মিথ্যা বলে — তাদের একজনকে তুই যদি জিজ্ঞেস করিস, ভাই বাসাবো যাব কোন রাস্তায়? সে ভাল মানুষের মত মুখ করে বলবে — বাসে করে চলে যান। সহজ হবে।'

'কোন বাসে উঠব?'

'প্রফেশনাল মিথ্যাবাদী তখন কি করবে জানিস? ভুল একটা বাসে উঠিয়ে দেবে। এতেই এদের আনন্দ। ভাল কথা, বরিশাল যাবার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলিস না। বাবাকে পাওয়া গেলে মজার একটা সারপ্রাইজ হবে। সারপ্রাইজ নষ্ট করে লাভ নেই।'

ভাইয়া বরিশাল থেকে কোন খবর ছাড়াই ফিরে এল। অন্তত আমার তাই ধারণা কারণ কাউকে সে কিছু বলল না। আমিও কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। সে যদি নিজ থেকে কিছু বলতে চায় বলবে।

আমি আবার ভাইয়ার ঘরে থাকতে শুরু করেছি। কারণ মা এখন আমাকে ঠিক সহ্য করতে পারছেন না। অল্পতেই খিটমিট করেন — একি গায়ে পা তুলে দিচ্ছিস কেন? ভালমত ঘুমা। অকারণে এত নড়াচড়া করিস না তো। বিশ্রী লাগে।

শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, আমি কি ভাইয়ার ঘরে ঘুমুব?

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, যা ইচ্ছা কর্ বিরক্ত করিস না।

ভাইয়ার স্বভাব কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আগের হাসি খুশী ভাব খানিকটা কমে গেছে। রাতে দু'টা টিউশানী করে খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরে। ভাত খেয়েই বুকের নীচে বালিশ দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। পত্রিকার লেখা লিখতে হয়। লেখার

সময় মেজাজ খুব খারাপ থাকে। কর্কশ গলায় বলে, চা দে তো রেনু।

আমি যদি বলি, চিনি ছাড়া দেব ভাইয়া? চিনি শেষ হয়ে গেছে।

ভাইয়া বিশ্রী ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠবে, চিনি নেই সেটা রাত-দুপুরে বলছিস কেন? দিনে মনে ছিল না? যেখান থেকে পারিস চিনি দিয়ে চা বানিয়ে আন।

আমি প্রায় মাঝরাতে চিনি আনতে দুলু আপাদের বাসায় গেলাম। তিনি ফ্লাস্ক ভর্তি চা বানিয়ে দিলেন। শুধু চা না, সঙ্গে এক প্লেট নোনতা বিসকিট। স্লাইস করে কাটা পনির।

ভাইয়া চা খায়, পনির মুখে দেয়। একবারও বলে না — কোত্থেকে জোগাড় হল। তার লেখালেখির সময়টা আমি বারান্দায় বসে থাকি। যে সব রাতে দুলু আপা গান বাজায় — আমার সময়টা ভাল কাটে। তবে বেশীরভাগ সময় বসে থাকতে হয় চুপচাপ। দুলু আপার স্বভাবেরও বোধ হয় পরিবর্তন হয়েছে। আগের মত একই গান লক্ষবার বাজান না।

শুনতে পাচ্ছি তাঁর বিয়ের কথা হচ্ছে। যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে তাকে একবার দুলু আপাদের বাড়িতে দেখেছি। আমার পছন্দ হয় নি। মানুষটা হয়তবা খুবই ভাল। প্রথম দর্শনে কোন পুরুষকেই আমার পছন্দ হয় না। পুরুষদের বোধ হয় উল্টোটা হয় — প্রথম দর্শনে সব মেয়েকেই ভাল লাগে।

৫

আচ্ছা আপনি কি খুব কাছ থেকে কাউকে মারা যেতে দেখেছেন?

একজন মানুষ মারা যাচ্ছে আর এক গাদা লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি সেই একগাদা মানুষের একজন — সেই কথা বলছি না। একজন মানুষ মারা যাচ্ছে, আপনি তার হাত ধরে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরে আর কেউ নেই। এমন অবস্থা কি আপনার জীবনে হয়েছে?

আমার হয়েছে।

সুলায়মান চাচার মৃত্যুর সময় আমি তাঁর পাশে। ঘরে আর কেউ নেই। মৃত্যু মুহূর্তে আমি তাঁর হাত ধরে বসে আছি। ব্যাপারটা ভাল করে গুছিয়ে বলি। চাচার শরীর খুব যখন খারাপ হল তখন তিনি ভাইয়াকে বললেন, তাঁকে কোন একটা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দিতে। ভর্তিটা করাতে হবে গোপনে যেন তাঁর তিন মেয়ে কিছুই জানতে না পারে।

ভাইয়া বলল, সেটা কি ঠিক হবে চাচা?

'খুব ঠিক হবে। ওদের না দেখলে আমি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকব। দেখলে আর বাঁচব না। তুমি আমাকে শহর থেকে দূরে কোন ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দাও। এই কাজটা কর।

ভাইয়া তাঁকে শহরের একটা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এল। সুলায়মান চাচা ক্লিনিকে যাবার আগে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। তাঁর বাসার কাজের মানুষ দু'জনকে বেতন ছাড়াও এক হাজার করে টাকা দিয়ে বিদেয় দেয়া হল। ওদের বললেন, তোরা দু'জনই দু' হাতে চুরি করেছিস। সেই অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম। আমিও তোদের বকাঝকা যা করেছি তা মনে রাখিস না।

ভাইয়াকে বললেন, বাড়ি বাবদ তোমার কাছে অনেক টাকা পাওনা। সেগুলি ক্ষমা করে দিলাম। তার বদলে তুমি প্রতিদিন একবার হাসপাতালে আমাকে দেখতে যাবে।

ভাইয়া বলল, নিতান্তই অসম্ভব। হাসপাতাল আমি সহ্যই করতে পারি না। তাছাড়া প্রতিদিন যে যাব — রিকশা ভাড়া পাবো কোথায়?

'রিকশা ভাড়া আমি দেব। যতবার যাবে কুড়ি টাকা করে রিকশা ভাড়া পাবে।'

'নানান ধান্ধায় থাকি চাচা। রোজ যেতে পারব না তবে প্রায়ই যাব। রেনু যাবে।'

'আমি যে কোথায় আছি তা যেন ভুলেও প্রকাশ না হয়।'

'প্রকাশ হবে না।

সুলায়মান চাচাকে ঢাকা শহরের মাঝখানে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হল। উনি গেলেন খুব হাসি মুখে। যেন পিকনিক করতে যাচ্ছেন কিংবা ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন। তাঁর ঘরের দরজায় বিশাল তালা লাগিয়ে চাবি আমাকে দিয়ে গেলেন।

'কাউকে চাবি দিবি না। কাউকে না। আমার তিন কন্যাকে তো নয়ই। মনে থাকে যেন।'

সুলায়মান চাচা চলে যাবার পরদিনই তাঁর ছোট্ট মেয়ে এসে আমাদের ঘরের কড়া নাড়তে লাগল। আমি দরজা খুলতেই তিনি বললেন, বাবা কোথায়?

আমি ভাল মানুষের মত মুখ করে বললাম, জানিনা তো।

'কিছুই জান না?'

'জ্বি — না।'

'কি আশ্চর্য কথা! একটা অসুস্থ মানুষ সে যাবে কোথায়?'

'হয়ত বেড়াতে গেছেন। এসে যাবেন। আপনি অপেক্ষা করুন।'

'বিছানা থেকে নামতে পারে না একটা মানুষ সে গেছে বেড়াতে? এসব কি বলছ পাগলের মত।'

ভদ্রমহিলা বিরস মুখে দোতলায় উঠে গেলেন। পেছনে পেছনে উঠলেন তাঁর স্বামী। এই ভদ্রলোকের চেহারা ভালমানুষের মত। শিশু শিশু মুখে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন। হাতে সিগারেট। তাঁকে দেখে মনে হল খুব মজা পাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরই ধুম ধুম শব্দ হতে লাগল। বুঝলাম তালা ভাঙ্গা হচ্ছে। সন্ধ্যার মধ্যে বাকি দু'বোনও চলে এলেন। আরো কিছু লোকজন এল। বাড়ি গমগম করতে লাগল। বড় বোন তাঁর স্বামীকে নিয়ে রাত দশটার দিকে আমাদের বাড়ির কড়া নাড়তে লাগলেন। ভাইয়া দরজা খুলে দিল। আমি এবং আপা বারান্দা থেকে তাদের কথাবার্তা শুনছি।

'আমার বাবা কোথায় গেছেন জানেন?'

'জানি না।'

'মিথ্যা কথা বলছেন কেন? আমাদের আরেক ভাড়াটে ইসমাইল সাহেবের স্ত্রী বললেন — তিনি দেখেছেন আপনি বাবাকে একটা সবুজ রঙের গাড়িতে করে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছেন।'

'উনি পুরোপুরি সত্যি বলেন নি। গাড়ির রঙ ছিল নীল, নেভী ব্লু।'

'তাহলে যে আপনি বললেন — আপনি জানেন না বাবা কোথায়?'

'ঠিকই বলেছি। আমি ভোরবেলায় বেরুচ্ছি — দেখি উনি গাড়িতে। আমাকে বললেন, কোথায় যাবে রঞ্জু? আমি বললাম, সদরঘাট। চাচা বললেন, উঠে আস, আমি তোমাকে গুলিস্তানে নামিয়ে দেব। আমি উঠলাম, গুলিস্তানে নেমে গেলাম।'

'বাবা কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করেন নি?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বললেন, ভাল দেখে একটা ক্যামেরা কিনতে চান। স্টেডিয়ামের ইলেকট্রনিক্স দোকানগুলিতে ঘুরবেন।'

'বাবার বিছানা থেকে নামার শক্তি নেই। আর তিনি কি-না স্টেডিয়ামে ঘুরে ঘুরে ক্যামেরা কিনবেন?'

'আমি যা জানি আপনাকে বললাম। তাছাড়া উনি বিছানা থেকে নামতে পারেন না বলে যা বলছেন তাও সত্যি না। হেঁটে হেঁটেই তো গাড়িতে উঠলেন। ধরেও নামাতে হল না।'

'আমি আপনার একটি কথাও বিশ্বাস করছি না।'

'আপনার কথা শুনে মনে খুব কষ্ট পেয়েছি বললে ভুল বলা হবে। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না এটাই স্বাভাবিক।

'বাবার সঙ্গে কি জিনিসপত্র ছিল?'

'আমার কোন কথাই তো আপনি বিশ্বাস করছেন না। শুধু শুধু প্রশ্ন করছেন কেন?'

'বলুন উনার সঙ্গে জিনিসপত্র কি ছিল?'

'বলতে চাচ্ছি না।'

এবার শোনা গেল ভদ্রমহিলার স্বামীর গলা। মেয়েদের মত চিকন স্বরে তিনি বললেন, আমি অন্য প্রসঙ্গে আপনাকে একটা কথা বলছি। সব ভাড়াটেদেরই বলা হয়েছে, শুধু আপনাকে বলা বাকি। কথাটা হচ্ছে পারিবারিক প্রয়োজনে পুরো বাড়িটা আমাদের দরকার। আপনাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

'কবে নাগাদ?'

'এক মাসের মধ্যে ছাড়তে হবে।'

'সেটা তো ভাই সম্ভব হবে না। প্রথমত মুখের কথায় নোটিশ হয় না। আপনাদের লিখিতভাবে জানাতে হবে। দ্বিতীয়ত, নোটিশ আপনারা পাঠালে হবে না। যাঁর বাড়ি তাঁকে নোটিশ দিতে হবে। নোটিশের পরেও তিনি মরে গিয়ে থাকলে ভিন্ন কথা — অবশ্যি তারপরও সমস্যা আছে — কোর্ট থেকে আপনাদের সাকসেসান সার্টিফিকেট বের করতে হবে।'

খানিকক্ষণ আর কোন কথাবার্তা শোনা গেল না। ভদ্রলোকের হয়ত ভাইয়ার কথাগুলি হজম করতে সময় লাগছে। সময় লাগাটাই স্বাভাবিক। এমন কঠিন কথার চট করে জবাব দেয়া যায় না। জবাবটা কি হয় শোনার জন্য অপেক্ষা করছি, রেগে আগুন হয়ে একটা কঠিন জবাব দেবার কথা। ভদ্রলোক তা দিলেন না। তিনি হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই বললেন, রঞ্জু সাহেব যেসব আইন-কানুনের কথা বললেন — তা সবই আমি জানি। তারপরেও বলছি সাতদিনের মৌখিক নোটিশে আপনাকে উচ্ছেদ করা আমার পক্ষে কোন সমস্যাই নয়। সাতদিনও খুব বেশী সময়। যাই হোক শুরুতে আমার স্ত্রী এক মাসের কথা বলেছে। কাজেই একমাসই বহাল রইল। আপনি একমাস পর বাড়ি ছেড়ে দেবেন।

'যদি না ছাড়ি?'

'আপনি বুদ্ধিমান লোক। ভুল করবেন বলে মনে হয় না। আচ্ছা ভাই — যাই। এত রাতে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।'

ভাইয়া গম্ভীর মুখে ভাত খেতে এল। মা বললেন, কি হয়েছে রে রঞ্জু? ভাইয়া শুকনো গলায় বলল, কিছু হয় নি।

'ঐ ভদ্রলোক তোকে কি বলল?'

'তেমন কিছু বলে নি।'

'তেমন কিছু বলেনি তাহলে তুই এমন গম্ভীর হয়ে আছিস কেন? তোর বাবা সম্পর্কে কিছু বলেছে?'

ভাইয়া বিরক্ত গলায় বলল, বাবা সম্পর্কে কিছু বলেনি। তোমার কি ধারণা পৃথিবীর সবাই বাবা সম্পর্কে আলোচনা করে? এইটাই কি তাদের কথা বলার একমাত্র বিষয়?

'তুই রেগে যাচ্ছিস কেন? আমি কি তোর বাবার কথা তুলে কোন অন্যায় করেছি?'

'আরে, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় আসছ — ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন আসছে কেন?'

'আমি লক্ষ্য করেছি — তোর বাবার বিষয়ে কিছু বললেই তুই রেগে যাস।'

'রেগে যাই না মা, বিরক্ত হই। দিনের মধ্যে এক হাজার বার জিজ্ঞেস কর তোর বাবার কোন খোঁজ পেলি। কি যন্ত্রণা খোঁজ পেলে আমি বলব না?'

'তোর বাবার কথা জিজ্ঞেস করা কি অপরাধ?'

ভাইয়া খাওয়া বন্ধ করে, প্লেট ঠেলে উঠে দাঁড়াল। মা শান্ত গলায় বললেন, ভাত খা রঞ্জু। আমি আর কোনদিন তোর বাবার প্রসঙ্গ তুলব না।

মা'র কথায় ভইয়া হকচকিয়ে গেল। আবার চেয়ারে বসল। কিন্তু কিছু খেতে পারল না। অতি অল্প সময়ে খুব বড় ধরনের একটা নাটক আমাদের বাসায় হয়ে গেল। মা'কে আমি চিনি — মা আর কোনদিনই বাবার প্রসঙ্গ তুলবে না।

সে রাতে ভাইয়া সকাল সকাল দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল। মা'র ঘরে গিয়ে দেখি মাও শুয়ে পড়েছেন। কয়েকবার ডাকলাম — মা সাড়া দিলেন না। গেলাম আপার ঘরে। আপা বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকাল। কিংবা স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই তাকাল কিন্তু আমার কাছে মনে হল খুব বিরক্ত। কারণ ইদানীং সারাক্ষণ সে বিরক্ত ভাব করে ঘরে বসে থাকে।

'আপা তোমার সঙ্গে ঘুমতে হবে।'

'কেন?'

'ভাইয়া, মা দু'জনই দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। তুমি কি জায়গা দেবে?'

'এটা কেমন কথা জায়গা দেব না কেন?'

আমি বিছানায় উঠতে উঠতে বললাম, কি বিশ্রী ব্যাপার হল আপা দেখেছ? ভাইয়া এটা কি করল?

আপা ঠাণ্ডা গলায় বলল, সবে শুরু। আরো কত খারাপ ব্যাপার হবে দেখবি।

'কি রকম খারাপ ব্যাপার?'

'এতদিনে যখন বাবার খোঁজ পাওয়া যায় নি — আর যাবেও না। ভাইয়া অনেক চেষ্টা–চরিত্র করেও চাকরি পাবে না। আমাদের এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। মা'র শরীর খুব খারাপ হবে। নানা রোগ–ব্যাধিতে ভুগবেন কিন্তু মরবেন না। বেঁচে থাকবেন। আশায় আশায় বাঁচবেন। বাবা একদিন ফিরে আসবেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এই আশায় বেঁচে থাকা। রেনু। আমাদের সামনে ভয়ংকর সব সমস্যা।'

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, তুমি কি এসব নিয়ে খুব চিন্তা কর?

'না।'

আপা শোবার আয়োজন করল। বাতি নিভিয়ে দিল। আমি বললাম, মাশারি খাটাবে না? খুব মশা তো।

'মশারির ভেতর আমার ঘুম আসে না। দমবন্ধ লাগে। এই জন্যেই তো একা থাকতে চাই। কাউকে সঙ্গে রাখতে চাই না।'

'তোমাকে মশায় কামড়ায় না?'

'খুব কম কামড়ায়। ফর্সা মানুষদের মশা কামড়ায় না। তোকে কামড়াবে। আমাকে না। মশাদের সৌন্দর্যবোধ প্রবল . . .।'

বলতে বলতে আপা হাসল। অনেকদিন পর আমি আপাকে হাসতে শুনলাম। আপা আমার গায়ে হাত রেখে বলল, রেনু তোদের রেখে আমি যদি চলে যাই। তোরা রাগ করিস না।

আমি চমকে উঠে বললাম, কোথায় যাবে?

'দেশের বাইরে। আমাদের একজন টিচার আছেন যাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় আমার প্রতি তাঁর খানিকটা আগ্রহ আছে। তিনি স্কলারশীপ নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন। আমাকে তাঁর চেম্বারে ডেকে বাইরে যাবার কথা খুব উৎসাহ নিয়ে বললেন। তারপর হঠাৎ আমাদের বাসার ঠিকানা চাইলেন।

'তুমি কি উনাকে পছন্দ কর?'

'না।'

'একেবারেই না?'

'একেবারেই না। কিছু মানুষ আছে যাদের দেখলে মনের উপর অসম্ভব চাপ পড়ে — ঐ লোকটি হচ্ছে সে রকম। এরা কি করে জানিস? এরা খুব হিসেব করে আগায়। বিয়ের ব্যাপারটাই ধর — এরা চায় সবচে' সুন্দরী মেয়েটাকে বিয়ে করতে। মেয়ে শুধু সুন্দরী হলে হবে না, পড়াশোনায় ভাল হতে হবে, বাবার প্রচুর টাকা থাকতে হবে।'

'উনি তেমন নাও তো হতে পারেন।'

'সেই সম্ভাবনা খুব কম। ঐ লোক আমাকে ছাড়াও আমার জানামতে আরো তিনটি মেয়ের ঠিকানা নিয়েছে। তিনজনই রূপবতী। সে এদের প্রত্যেকের বাসায় যাবে। হিসাব নিকাশ করবে। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকব আমি।'

'তুমি টিকে থাকবে কেন?'

'আমার সে রকমই মনে হচ্ছে। আমি কিছু কিছু জিনিস আগে আগে বুঝতে পারি। আর কথা বলতে ভাল লাগছে না, ঘুমুতে চেষ্টা কর।'

'চেষ্টা করেও লাভ নেই আপা, আমার সহজে ঘুম আসে না।'

আপা আবার হাসল। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, হাসছ কেন?

আপা বলল, যাদের মাথায় রাজ্যের চিন্তা তারা বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। প্রকৃতি তাদের ঘুম পাড়িয়ে চিন্তামুক্ত করে। যারা সুখী মানুষ তারাই সহজে ঘুমুতে পারে না। বিছানায় গড়াগড়ি করে।

'তোমাকে কে বলল?'

'আমার তাই ধারণা। দেখিস না আমি কেমন চট করে ঘুমিয়ে পড়ি। বাবাও তাই। বাবার ঘুমের সমস্যার কথা কখনো শুনেছিস? শোয়ামাত্র ঘুম। বাবাকে কখনো দেখেছিস ঘুম হচ্ছে না বলে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছে?'

'না।'

'মিলল আমার কথা?'

আমি জবাব দিলাম না। আপা মৃদুগলায় বলল — দুলুর কথা ধর। এই মেয়ে কি রাতে ঘুমায়? আমার তো মনে হয় জেগেই কাটায়। অথচ ওর মত সুখী মেয়ে বাংলাদেশে ক'টা আছে?

কথা শেষ করে আপা পাশ ফিরল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি সম্ভবত সুখী মেয়ে। জেগে রইলাম। দুলু আপাও জেগে আছে। তাকে আগের রোগে ধরেছে। ক্রমাগত গান বাজিয়ে যাচ্ছে। একই গান — বার বার শুনলে গানটা আর গান থাকে না। মন্ত্রের মত হয়ে যায় । শেষের দিকে মনে হয় কে যেন কানের কাছে মন্ত্র পাঠ করছে :

যায় দিন, শ্রাবণ দিন যায়
আঁধারিল মন মোর আশঙ্কায়
মিলনের বৃথা প্রত্যাশায়
যায় দিন, শ্রাবণ দিন যায় . . .

আমি আধোঘুম আধো জাগরণে মন্ত্রপাঠ শুনতে লাগললাম

সুখী মেয়েরা রাস্তায় কি ভাবে হাঁটে আপনি জানেন? জানেন না? আমিও জানি না কিন্তু হাঁটতে চেষ্টা করি সুখী মেয়ের মত। ভাব করি যেন হাঁটতে খুব ভাল লাগছে, যা দেখছি তাতেই মুগ্ধ হচ্ছি। কলেজ ছুটি হয়ে গেছে বাসায় বলিনি। ঠিক ন'টায় তাড়াহুড়া করে বই খাতা সঙ্গে নিয়ে বের হই। বেরুবার আগে মা'র সামনে যাই। নীচু গলায় বলি — টাকা দিতে পারবে? না পারলে অসুবিধা নেই।

মা পাঁচ টাকার একটা নোট এগিয়ে দেন। কোত্থেকে দেন কে জানে। বেশীর ভাগ দিন এই নোটটা খরচ হয় না। হেঁটে বেড়ালে টাকা খরচ হবে কেন? ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কোন একটা রেকর্ডের দোকানে ঢুকি। খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে

বলি, সতীনাথের পুরানো গানের একটা ক্যাসেট অতি দ্রুত করে দিতে পারেন? আমার এখনি দরকার। আমি এক্সট্রা পে করতে রাজি আছি। দোকানদার হাই তুলতে তুলতে বলে — এক সপ্তাহের আগে সম্ভব হবে না। হেভী বুকিং।

'বাড়তি টাকা দিলেও হবে না?'

'আর্জেন্ট করে দিতে পারি। ডাবল পেমেন্ট। তাও আজ পাবেন না। দু'দিন লাগবে।'

আমি অত্যন্ত দুঃখিত হবার ভঙ্গি করে বলি, তা হলে তো হচ্ছে না। আচ্ছা, সতীনাথের ঐ গানটা একটু বাজান তো শুনি — "এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকেনাতো মন।"

দোকানদার নিতান্ত অনিচ্ছায় খানিকটা বাজায়। বাজাতে বাজাতে হাই তুলে। ক্যাসেটের দোকানের লোকজন ক্রমাগত হাই তুলে কেন কে জানে। আমি যে ক'টা দোকানে গেছি সব জায়গায় এক অবস্থা — এরা হাই না তুলে কথা বলতে পারে না। কথা বলেও কম। রাণীক্ষেত রোগ হলে মুরগীরা যেমন ঝিম ধরে থাকে এরাও সে রকম। সারাক্ষণ ঝিম ধরে আছে।

দুপুরের পর হাঁটতে ভাল লাগে না। বাসায় ফিরে আসি। গোসল করে লম্বা একটা ঘুম দেই। সুলায়মান চাচাকে দেখতে যাই না কারণ তাঁর মেয়েরা খোঁজ পেয়ে গেছে। তারা সারাক্ষণ বাবাকে ঘিরে থাকে। যে দু'বার গিয়েছিলাম এমন করে তাকিয়েছে যেন আমি রক্তচোষা ড্রাকুলা। তার বাবার রক্ত খাবার জন্যে আসি।

হাসপাতালেই সবচে' ছোট মেয়েটি আমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে বলল, বাড়ি ছাড়ার জন্যে আপনাদের এক মাস সময় দেয়া হয়েছিল। মাস প্রায় শেষ হতে চলল। আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম। আমার স্মৃতি শক্তি ভাল না।

আমি বললাম, মনে করিয়ে খুব ভাল করেছেন। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

'অন্য তিনজন ভাড়াটের মধ্যে দু'জন চলে গেছে। আর একজন যাবে এই শুক্রবারে।'

'ও আচ্ছা।'

'বাড়িটা আমাদের খুব জরুরী ভাবে দরকার।'

'ভাইয়াকে বলব। ঐ তো গার্জিয়ান।'

সুলায়মান চাচাকে দেখতে যেতে ভাল না লাগার আরেকটা কারণ হচ্ছে তিনি এখন কথাবার্তা একেবারেই বলেন না। তাঁর শরীর দ্রুত খারাপ হয়েছে। চোখ গাঢ় হলুদ। নিঃশ্বাস ফেলার সময় অদ্ভুত শব্দ হয়। আমার দিকে এমনভাবে তাকান

যেন চিনতে পারছেন না। তবে চলে আসবার সময় মেয়েদের বলেন — রেনুর হাতে কুড়িটা টাকা দাও তো। রিক্সাভাড়া।

মেয়েরা তৎক্ষণাৎ বলে, দিচ্ছি।

কিন্তু দেয় না। বরং এমন ভঙ্গি করে যে আমার বলতে ইচ্ছা করে, কিছু দিতে হবে না। আমার কাছে একটা পাঁচ টাকার নোট আছে। আপনি দয়া করে রেখে দিন।

ডাক্তাররা সুলায়মান চাচার ব্যাপারে জবাব দিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়। তাঁর শরীরের কোন যন্ত্রপাতিই এখন কাজ করছে না। লিভার কাজ করছে না, কিডনি কাজ করছে না, শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। মাথার চুলও উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতালে ঢোকার আগে কিছু চুল ছিল। এখন মাথা প্রায় ফাঁকা। কথাবার্তাও অসংলগ্ন। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে এমন ভাবে যান যে খটকা লাগে।

ঐ দিন শীত নিয়ে কথা হচ্ছে। শেষ রাতে না-কি তার খুব শীত লাগে। আবার গায়ে চাদর দিলে গরম লাগে।

এই প্রসঙ্গে বলতে বলতে হঠাৎ বললেন, রেনু তোর বাবা কাজটা ভালই করেছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কোন কাজ?

'এই যে লুকিয়ে আছে। আমার কি ধারণা জানিস? আমার ধারণা উনি কোথাও ঘাপটি মেরে আছেন। বেশী দূরে না, কাছেই। তোদের আশেপাশে যাতে তোদের উপর লক্ষ্য রাখতে পারেন। এক সময় বের হবেন — তোদের চমকে দেবেন।'

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, এই প্রসঙ্গ থাক চাচা।

'আচ্ছা থাক। তবে আমি কিন্তু ভুল বলছি না। যা বললাম আমার মনের কথা। তোর বাবা যে কাজটা করেছেন — আমার এমন একটা কাজ করার ইচ্ছা সারা জীবন ছিল। করতে পারিনি। সাহসের অভাবে পারিনি। গৃহত্যাগ করা সহজ ব্যাপার না। মহাপুরুষ ছাড়া কেউ পারেন না।'

'বাবা গৃহত্যাগ করেন নি। উনি গৃহত্যাগের মানুষ না। খুব ঘরোয়া মানুষ। ব্যবসায়ের কারণে বাইরে যেতেন। যে ক'দিন বাইরে থাকতেন ছটফট করতেন।'

'মানুষকে এত চট করে বোঝা যায় না রে রেনু। মানুষ খুব জটিল বস্তু। গৌতম বুদ্ধও তো সংসারী মানুষ ছিলেন। তাঁর ছিল পরমা সুন্দরী স্ত্রী যশোধারা। চাঁদের মত ছেলে ছিল — রাহুল। ছেলেকে এক মিনিট চোখের আড়াল করতেন না। সেই গৌতম বুদ্ধও কি ঘুমন্ত স্ত্রী-পুত্র রেখে পালিয়ে যাননি?'

'বাবা গৌতম বুদ্ধ না চাচা। একজন অতি সামান্য ব্যবসায়ী। যাকে জীবিকার জন্যে সামায়িকভাবে গৃহত্যাগ করতে হত।'

'আর একটা ভুল কথা বললি রেনু। সব মানুষের মধ্যেই গৌতম বুদ্ধের বীজ থাকে। সময়মত পানি পায় না বলে বীজ থেকে গাছ হয় না। তুই যখন রাস্তায় হাঁটবি চোখ কান খোলা রেখে হাঁটবি। আমি নিশ্চিত অনেকবার তোর সঙ্গে তোর বাবার দেখা হয়েছে, তুই খেয়াল করিস নি।'

আমি সব সময়ই চোখ কান খোলা রেখে হাঁটতাম। বাবা নিখোঁজ হবার পর তা আরো বেড়েছে। তাতে কোন লাভ হয় নি। তবে কেন জানি আমার নিজের মধ্যেই একটা ক্ষীণ আশা একদিন পেছন থেকে বাবা ডেকে উঠবেন — কে যাচ্ছে, রেনু না?

আমি থমকে দাঁড়াব। বাবা হতভম্ব গলায় বলবেন — শাড়ি পরে যাচ্ছিলি, আমি তো চিনতেই পারি নি। শাড়ি পরছিস কবে থেকে?

'অল্পদিন থেকে পরছি। ঘরে পরি না। বাইরে বের হলে পরি।'

'সুন্দর লাগছে। আচ্ছা কিনে দেব। ভাল শাড়ি কিনে দেব। চল এখনি কিনে দি। কিছু টাকা সঙ্গে আছে।'

'শাড়ি কিনতে হবে না বাবা, তুমি আমার সঙ্গে চল তো।'

'কোথায় যাব?'

'বাসায়। আবার কোথায়? তোমার যে ঘর বাড়ি আছে এটা কি তোমার মনে নেই?'

'হুঁ। ভাল কথা বলেছিস। আসলে ব্যাপারটা কি জানিস . . . '

'আসল ব্যাপারটা কি?'

বাবা বিব্রত ভঙ্গিতে হাসতে থাকেন। আমি তাঁর হাত ধরি। কল্পনা এই পর্যন্ত। মানুষের কল্পনারও সীমা থাকে। আমার তো মনে হয় না কেউ কখনো কল্পনা করে সে উড়তে পারে। আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কল্পনাকেও যুক্তির ভেতর থাকতে হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাশক্তিও কমতে থাকে। একটা সময় আসে যখন মানুষ কল্পনা করে না। আমার মা'র বোধ হয় সেই সময় যাচ্ছে। তিনি তাকিয়ে থাকেন শূন্য চোখে। মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কি যেন বলেন। আমি একদিন বললাম, মা তুমি কি বলছ? তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, কই কিছু বলছি না তো।

আমাদের বড় আপার মৃত্যুদিন গেল গত পরশু। আমরা সবাই খুব আতংকগ্রস্ত ছিলাম মা না জানি কি করেন। তিনি কিছুই করলেন না। নিতান্তই

স্বাভাবিক আচরণ করলেন। সব বার শোকের এই তীব্র দিনটিতে বাবা-মা এক সঙ্গে থাকেন। এবার মা একা। এবং তাঁর মধ্যে কোন বিকার নেই। নামাজে অন্য দিনটিতে যতটা সময় দেন, আজও তাই দিলেন। সন্ধ্যার পর বারান্দায় এসে বসলেন। আপাকে বললেন, মীরা আমাকে এক কাপ চা দিবি মা। তাঁকে চা দেয়া হল। তিনি চা খেলেন। রাতের খাবারও খেলেন নিঃশব্দে। এর আগে কোনদিন তাঁকে রাতে কিছু খেতে দেখিনি। রাত দশটার দিকে ঘুমুতে গেলেন। আপা আমাকে ডেকে বললেন — তুই মা'র সঙ্গে ঘুমো। কোন সমস্যা হলে আমাকে ডাকবি। আমি জেগে আছি।

'মা থাকতে দেবে না। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

'দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখ।'

আমি বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, মা তোমার সঙ্গে ঘুমুব। মা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বললেন, আয়।

আমি ঘরে ঢুকলাম, মার পাশে শুয়ে পড়লাম। মা মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন — তোর তো কলেজ বন্ধ, তুই সারাদিন কি করিস? আমি হকচকিয়ে গেলাম। ক্ষীণ স্বরে বললাম, কলেজ বন্ধের কথা তোমাকে কে বলল ?

'আমি জানি।'

'কবে জানলে?'

'অনেক দিন আগেই জানি। তুই কি কারো বাসায় যাস?'

'না।'

'রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াস?'

'হুঁ।'

'তোর বাবাকে খুঁজিস?'

আমি জবাব দিলাম না। মা আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আর হাঁটাহাঁটির দরকার নেই। তোর বাবা ফিরে আসবেন না। উনি জীবিত নেই।

'কি বলছ মা?'

'জীবিত থাকলে আজকের দিনে চলে আসত। আজ যখন আসেনি আর কোনদিনও আসবে না। তুই ঘুমো তো রেনু। রোদে ঘুরে ঘুরে কি কালো হয়ে গেছিস! আয়নায় নিজেকে দেখিস না? এখনি তো সুন্দর হওয়ার বয়স।'

মা এমন কোন আবেগের কথা বলছেন না। সহজ স্বাভাবিক কথা। কিন্তু আমার কান্না পেয়ে গেল। আমি নিঃশব্দে কাঁদছি। এমন ভাবে কাঁদছি যেন মা কিছুতেই বুঝতে না পারেন।

'রেনু!'

'জ্বি।'

'তোর বড় আপার জন্য আমি নিজের হাতে একটা জামা বানিয়েছিলাম। টকটকে লাল সিল্কের জামা। ঐ জামাটা তোর বাবা তার ব্রীফকেসে কাগজ পত্রের নীচে লুকিয়ে রাখে — বছরের মাত্র একদিন গভীর রাতে জামাটা বের করা হয়। আজ সেই রাত। তোর বড় আপাকে লোকটা কোনদিন দেখে নি — কিন্তু..'

'বাদ দাও মা।'

'কত যে কল্পনা ছিল অরুকে নিয়ে। দরিদ্র মানুষ — জিনিসপত্র কিনে বাড়ি বোঝাই করে ফেলেছিল। জুতা কিনেছিল তিন জোড়া। চারটা জামা। বাচ্চাদের গোসল দেবার জন্য লাল প্লাস্টিকের গামলা। মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর সব বিলিয়ে দেয়।'

'মা, আমি কিছু শুনতে চাচ্ছি না।'

'এই যে তোর বাবা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, ঠিক যে ব্যবসায়ের কারণে ঘুরে বেড়ায় তা কিন্তু না। ঘরে তার মন টিকে না। কিছুদিন ঘরে থাকলেই সে অস্থির হয়ে উঠে। অরু বেঁচে থাকলে — এ রকম হত না। মানুষটা ঘরেই থাকত।'

'মা ঘুমাও।'

মা পাশ ফিরলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম।

ঘুম ভাঙ্গল সন্ধ্যা সন্ধ্যায়। নিজ থেকে ভাঙ্গল না। আপা এসে ধাক্কা দিয়ে তুলল। শংকিত গলায় বলল, তোকে নিতে এসেছে, তাড়াতাড়ি উঠ।

'কে নিতে এসেছে?'

'সুলায়মান চাচার বড় মেয়ে। চাচার শরীর খুব খারাপ। তোকে আর ভাইয়াকে নিতে এসেছে। তোদের দেখতে চেয়েছেন। ভাইয়া বাসায় নেই। তুই যা।'

আমি বিছানা ছেড়ে নামলাম। হাত মুখ ধুতে বারান্দায় গিয়ে দেখি সুলায়মান চাচার বড় মেয়ে মোড়ায় বসে আছেন। ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। আমাকে দেখে ভাঙ্গা গলায় বললেন — তাড়াতাড়ি কর রেনু।

সুলায়মান চাচা মারা গেলেন ঠিক সন্ধ্যায়। ঘরে তখন শুধু আমি একা। সুলায়মান চাচা ইশারায় সবাইকে চলে যেতে বলেছিলেন। ঘরে কেউ ছিল না। তিনি আমাকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। আমি কাছে গেলাম। তাঁর হাত ধরে

পাশে দাঁড়ালাম। তিনি কিছু একটা বলতে চাইলেন। বলতে পারলেন না। মৃত্যু সম্পর্কে অনেককে বলতে শুনেছি — মানুষ কখন মারা যায় বুঝা যায় না, এমন কি ডাক্তাররাও ধরতে পারেন না। পরীক্ষা টরীক্ষা করে বলতে হয় রোগী মৃত। আমার ধারণা কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। যেই মুহূর্তে সুলায়মান চাচা মারা গেলেন আমি টের পেলাম। তারপরেও অনেকক্ষণ তার হাত ধরে বসে রইলাম। একটা মানুষ কত ভাল ছিল তা টের পাওয়া যায় মৃত্যুর পর। আমি তো খুব বেশী মানুষের সঙ্গে মিশিনি। আমার ক্ষুদ্র জীবনে দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি মারা গেলেন আমার চোখের সামনে। আমার কাঁদা উচিত। কাঁদতে পারছি না। দুঃখে হৃদয় অভিভূত হওয়া উচিত। তাও হচ্ছে না। আমি শান্ত ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। ক্লিনিকের বারান্দায় সবাই দাঁড়িয়ে আছে। আমি শান্ত মুখে বললাম, যান, আপনারা ভেতরে যান।

বড় মেয়ে আগ্রহ নিয়ে বললেন, বাবা কেমন আছেন?

আমি কিছু না ভেবেই বললাম, ভাল।

ঐ দিন সন্ধ্যা আমার জীবনের একটা বিশেষ সময়।

কাজেই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এখন যা বলব, খুব মন দিয়ে শোনার জন্য। আমি ক্লিনিক থেকে বের হলাম। রিকশা নিতে যাব — মনে হল — আসার সময় টাকা নিয়ে আসিনি। তাতে অসুবিধা নেই। একটা রিকশা নিয়ে বাসায় যেতে পারি। কিন্তু বাসায় পৌঁছে যদি দেখি — মার কাছে টাকা নেই।

পথ খুব বেশী না। এক মাইলেরও কম হবে। অনায়াসেই হেঁটে যাওয়া যায়। রাস্তাভর্তি লোকজন। সোডিয়াম লাইট জ্বলছে। অসুবিধা কি? আমি হাঁটতে শুরু করলাম। মগবাজার চৌরাস্তায় পৌঁছতেই একজন নিতান্ত অপরিচিত লোক আমাকে পেছন থেকে ডাকল — রেনু, এই রেনু।

আমি চমকে পেছনে ফিরে দেখি রিকশায় ৩০/৩৫ বছরের এক ভদ্রলোক বসে আছেন। দু'হাতে দুটা বাজারের ব্যাগ। পায়ের কাছে ধবধবে শাদা রঙের একটা হাঁস। ভদ্রলোকের চেহারার বর্ণনা দেই — খুব সাধারণ চেহারা। তবে বড় বড় চোখ। চোখের দিকে তাকালে কাজি নজরুল, কাজি নজরুল মনে হয়। কাজি নজরুল মনে হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে তাঁর মাথার চুল লম্বা। ফ্যাশানের লম্বা না। অনেকদিন চুল না কাটলে চুল যেমন ঝাকড়া ঝাকড়া হয়ে যায় তেমন। তাঁর গায়ে খয়েরী রঙের সার্ট।

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক বিরক্ত গলায় বললেন, কি যন্ত্রণায় পড়েছি দেখ তো রেনু। রিকশার চাকা বার্স্ট হয়েছে। বাজারের ব্যাগ একটা ফুটো হয়েছে। টপ টপ করে গোল আলু পড়ছে। হাঁস একটা কিনেছি। ব্যাটা ঠিকমত বেঁধে দেয় নি। উড়ে যাবার চেষ্টা করছে। হাঁসটাকে পা দিয়ে চেপে ধরে রাখতে হচ্ছে।

আমি বললাম, আপনাকে কিন্তু আমি চিনতে পারছি না।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, আমাকে চিনতে পারছ না মানে? তুমি রেনু না?

'জ্বি।'

'আমি মবিন। মবিনুর রহমান।'

'আমি এখনো চিনতে পারছি না।'

'বল কি। তুমি কলাবাগানে থাক না?'

'জ্বি — না?'

'তুমি আউয়াল সাহেবের মেয়ে না?'

'জ্বি — না।'

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে গেলেন। আমি নিজেও বিস্মিত। তিনি যে মেয়েকে চেনেন সে নিশ্চয়ই দেখতে আমার মত। তার নামও রেনু। এমন মিলের কোন মানে হয়?

ভদ্রলোক বললেন, আমি অসম্ভব রকম লজ্জিত। তুমি কিছু মনে করো না। একবার তুমি বলে ফেলেছি বলেই এখনো বলছি। নয়ত বলতাম না। মাই গড। হোয়াট এ মিসটেক!

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি কিছু মনে করি নি।

ভদ্রলাকে বললেন, আমি যে মেয়ের কথা বলছি — সে দেখতে অবিকল তোমার মত। আমি যে ভুল করেছি সেই ভুল ঐ মেয়েকে যারা চেনে তারা সবাই করবে। তুমি বিশ্বাস কর আমার কথা।

'আপনাকে এত লজ্জায় পড়তে হবে না। আমি কিছু মনে করি নি। আচ্ছা যাই? আপনার হাঁসটা কিন্তু পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ভাল করে চেপে ধরুন।'

আমি হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এসে একবার পেছনে ফিরলাম। ভদ্রলোক রিকশা থেকে নেমেছেন। হাতে ব্যাগ বা হাঁস কিছুই নেই। তাঁর পলকহীন দৃষ্টি আমার দিকে। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল তিনি লজ্জায় পাথর হয়ে গেছেন।

সেই রাতে আমার একফোঁটা ঘুম হল না। তার কারণ সুলায়মান চাচার মৃত্যু নয়। কারণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা ঐ ভদ্রলোক। সারাক্ষণ ঐ ছবি আমার মনে পড়তে লাগল। শেষ রাতে সামান্য তন্দ্রার মত এল — তখনি ভদ্রলোককে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি দু'টি রাজহাঁস নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। দরজার কড়া নাড়লেন। আমি দরজা খুললাম। ভদ্রলোক বললেন, রেনু দু'টা রাজহাঁস নিয়ে এসেছি। দেখ তো পছন্দ হয় কি–না।

আমি বললাম, আপনি কে? আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।

ভদ্রলোক আহত ও অপমানিত গলায় বললেন, কি বলছ তুমি?

'আমি আপনার নামও তো জানি না।'

'আমার নাম মবিন। মবিনুর রহমান।'

'এই নামে আমি কাউকে চিনি না। প্লীজ আপনি যান তো।'

'আচ্ছা যাচ্ছি। হাঁস দু'টা রেখে দাও।'

ভদ্রলোক হাঁস দু'টা ঘরের ভেতর ছেড়ে দিলেন। তারা প্যাক প্যাক করে সারা ঘরময় ছুটে বেড়াতে লাগল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। সন্ধ্যাবেলা বাজার করে ফিরছে। যার চেহারাও আমি সম্ভবত ভাল করে দেখিনি। সামান্য কিছু কথা হয়েছে। আর তাতেই সারারাত আমার ঘুম হল না।

ভোরবেলা আমি পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। একটা আলগা ফূর্তির ভাব নিয়ে আসতে চেষ্টা করলাম। টবে আমাদের দু'টা গোলাপ গাছ আছে — কাচি নিয়ে গাছ ছেঁটে দিতে গেলাম। গাছের ডাল কাটতে কাটতে সম্ভবত গুনগুন করে গানও গাইলাম।

আপা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল । সে কঠিণ গলায় বলল, কি হয়েছে রেনু ?

'কিছু হয়নিতো।'

'তুই খুশী হবার ভান করছিস। কেন?'

আমি রাগী গলায় বললাম, তুমি বেশী বেশী বোঝ, আমি মোটেই খুশী হবার ভান করছি না। কাল সন্ধ্যায় একজন মানুষকে মারা যেতে দেখলাম। অপরিচিত কাউকে না, খুব পরিচিত একজন কে। সারা রাত আমার ঘুম হয় নি। কাজেই আমি এখন কি করছি না করছি তা দেখে তুমি আমার চরিত্র বুঝে ফেলবে কি ভাবে? তুমিতো অন্তর্যামী নও।

আপা কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

প্রতিদিন আমি কিছুক্ষণের জন্য হলেও ঘর থেকে বের হই । সেদিন বের হলাম না। সারা সকাল পড়ার চেষ্টা করলাম। দুপুরে ঘুমুতে গেলাম। রাতে ঘুম হয়নি। দুপুরে শোয়া মাত্র ঘুম আসার কথা। ঘুম এল না।

বিকেল চারটার দিকে মনে হল — মবিনুর রহমান সাহেব নামের ভদ্রলোক বাজার করে নিশ্চয় ঐ রাস্তায় ফিরবেন। যদিও পর পর দু'দিন বাজার করার কথা না। কিন্তু উনি যেমন ভুলো মনের মানুষ হয়ত কিছু একটা ভুলে আনা হয়নি। আজ আবার আনতে হবে। কিছু কিছু মানুষ আছে বিকেলে বাজার করতে পছন্দ করে। অফিস থেকে সরাসরি কাঁচা বাজারে চলে যায় . . . । এখন যদি আমি ঘর থেকে বের হই — ভদ্রলোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

শাড়ি পাল্টাচ্ছি। আপা বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

'মিতুদের বাসায়।'

'এখন মিতুদের বাসায় যাচ্ছিস? সন্ধ্যাতো হয় হয় ফিরবি কি ভাবে?'

'মিতুর ছোটমামা পৌঁছে দেবেন। যেতেই হবে। মিতুর জন্মদিন। খুব করে বলে দিয়েছে।'

'জন্মদিনে খালি হাতে যাবি?'

'উপায় কি?'

'তুই কি সত্যি মিতুর জন্মদিনে যাচ্ছিস?'

আমি কঠিন গলায় বললাম, তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন আপা? কেন তোমার মনে হল আমি মিথ্যা কথা বলছি?

'তুই খুব সাজগোজ করেছিস তাই বলছি।'

'বন্ধুর জন্মদিনে সাজগোজ করতে পারব না?'

'অবশ্যই পারবি। কিন্তু আগেওতো আরো অনেক জন্মদিন হয়েছে। তোকে কখনো সাজতে দেখিনি। আজ একেবারে টিপ পরেছিস।'

আমি টিপ খুলে ফেললাম। আপা বলল, রাগ করিস না। এম্নি বললাম। লাল-টিপে তোকে সুন্দর লাগছে। আমার কাছে পঞ্চাশটা টাকা আছে। নিয়ে যা। একটা বই টই কিনে দিস। বন্ধুর জন্মদিন। খালি হাতে কেন যাবি।

আমি গেলাম ঐ রাস্তায়। আধ ঘন্টার মত অপেক্ষা করে ফিরে এলাম। আপা দরজা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুই কি আমাকে কিছু বলবি?

আমি বললাম, বলব।

'আয় আমার ঘরে আয়।'

আমি সব বললাম কিছুই বাদ দিলাম না। আমার ধারণা ছিল আপা কথা শুনে হেসে ফেলবে। সে হাসল না। আমার হাত ধরে বসে রইল। আমি বললাম, আমার এ রকম হল কেন আপা?

'তুই ব্যাপারটা যত বড় করে ভাবছিস আসলে এটা মোটেই তেমন কোন বড় ব্যাপার না। খুব সামান্য ব্যাপার। ঐ সন্ধ্যায় তোর মনটা ছিল অন্যরকম। কাছ থেকে একজন মানুষের মৃত্যু দেখেছিস। খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছিলি। বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিস একা একা। যখন তোর মনে হচ্ছে — তুই একা তোর আশে পাশে কেউ নেই তখন খুব কোমল গলায় একজন ডাকল — রেনু। রেনু।

ঐ ভদ্রলোকের গলার স্বরে হয়ত বাবার গলার স্বরের খানিকটা মিল ছিল। তুই চমকে উঠলি। তোর সমস্ত শরীর হয়ত ঝন ঝন করে উঠল। তারপর খানিকক্ষণ ভদ্রলোকের সঙ্গে তোর কথা হল। ভদ্রলোক অসম্ভব বিব্রত হলেন। বিব্রত মানুষের উপর এম্নিতেই আমাদের মমতা বোধ হয়। তোর চরিত্রে মমতার অংশ প্রবল। তুই অনেকখানি মমতা বোধ করলি — এই হচ্ছে ব্যাপার।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি এত গুছিয়ে কি করে বললে?

আপা হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, আজ রাতে ভাল করে ঘুমো, ভোর বেলা দেখবি সব ধুয়ে মুছে গেছে। কাল সন্ধ্যায় আর সেজেগুজে ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে না।

আপার বেশির ভাগ কথাই ঠিক হয়। এই কথা ঠিক হল না। ঘটনাটা মোটেই ধুয়ে মুছে গেল না। আমি প্রতিদিন ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা শুরু করলাম। তবে বিকেলে নয় সকালে। সকালে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অফিসে যাবেন। একদিন না একদিন দেখা হবেই। তিনি চমকে উঠে ডাকবেন — রেনু, এই রেনু। আমি তাঁকে চিনতে পারছি না এই ভঙ্গি করব না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাব।

৬

দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমুব বলে শুইনি। কেন জানি খুব ক্লান্ত লাগছিল। মা ডাকলেন, খেতে আয় রেনু। আমি বললাম, আসছি। বলেই বিছানায় শুয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। মা ডেকে তুললেন না। মা আগের মত নেই। একবার ডেকেই দায়িত্ব শেষ করেছেন। সারাদিন না খেলেও দ্বিতীয়বার ডেকে কিছু বলবেন না। তাছাড়া ভাইয়ার সঙ্গে মা'র আবার ঝগড়া হয়েছে। শীতল ঝগড়া। এই ঝগড়ার পর মা-আরো চুপ করে গেছেন । কারো সঙ্গেই কিছু বলছেন না।

ঝগড়ার কারণ অতি তুচ্ছ। সকালবেলা ভাইয়াকে চা দিতে দিতে মা বললেন, তুই কি একবার বগুড়া যাবি?

ভাইয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, অবশ্যই যাব। কি ব্যাপার?

মা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, স্বপ্নে দেখলাম তোর বাবা বগুড়ায়।

ভাইয়া গম্ভীর গলায় বলল, স্বপ্নের উপর নির্ভর করে এতদূর যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

'আমার স্বপ্ন ঠিক হয়।'

'তুমি যে স্বপ্ন বিশারদ তাতো মা জানতাম না ।'

মা কঠিন গলায় বললেন, ঠাট্টা করছিস?

'না ঠাট্টা করছি না। শুধু জানতে চাচ্ছি তোমার স্বপ্নের উপর নির্ভর করে এতদূর যাওয়াটা কি ঠিক হবে।'

'ঠিক না হলে যাবি না।'

'রাগের কথা না মা । যুক্তির কথা। বগুড়াতো ছোট্ট একটা জায়গা না। অনেক বড় জায়গা। সেখানে বাবাকে কোথায় খুঁজব? স্বপ্নে এ্যাড্রেস পেয়েছ?'

'তোকে কিছু খুঁজতে হবে না। স্বপ্নতো স্বপ্নই। স্বপ্নের আবার কোন মানে আছে।'

বলতে বলতে মা'র চোখে পানি এসে গেল। মা আঁচলে মুখ ঢেকে তাঁর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সেই দরজা রাত দশটার আগে খোলা হল না।

মা'কে খুশি করবার জন্যেই ভাইয়া বগুড়া ঘুরে এল। হোটেলগুলিতে খোঁজ করল। থানার ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করল। কাজের কাজ কিছু হল না। ভাইয়া ফিরল ঘুসঘুসে জ্বর নিয়ে।

মা'র রাগ পড়ল না।

ভাইয়া যখন বলল, মা হাসি মুখে দু'টা কথা আমার সঙ্গে বল। বগুড়া দেখে এলামতো।

মা কিছুই বললেন না। ভাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এর পরের বার যদি এ জাতীয় স্বপ্ন দেখ তাহলে অবশ্যই আসল ঠিকানা জেনে নেবে।

যে কথা বলছিলাম সে কথায় ফিরে আসি। আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা বলার ভঙ্গিতে বিরক্ত হচ্ছেন। আসলে আমি এক নাগাড়ে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি না। প্লীজ কিছু মনে করবেন না।

ক্লান্ত হয়ে শুয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে গেছে। দিনে ঘুমুলে আমি সব সময় স্বপ্ন দেখি। সেদিনও স্বপ্ন দেখছি। দুঃস্বপ্ন। যেন একটা লোমশ ভালুকের মত লোক দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে।

হাতুড়ি দিয়ে দরজায় প্রচন্ড জোরে বাড়ি দিচ্ছে। তার হাতুড়ির শব্দেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠে শুনি সত্যি সত্যি দরজায় কে যেন টোকা দিচ্ছে। আমি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। ভবঘুরে টাইপের একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে চাদর । লম্বা লম্বা চুল । চোখ লাল। আমি বললাম, কাকে চান?

'রঞ্জু সাহেব বাসায় আছেন?'

আমি না জেনেই বললাম, উনি বাসায় নেই। আমার ইচ্ছে করছিল না যে ভাইয়া লোকটার সঙ্গে কথা বলে। আমার মনে হচ্ছিল লোকটা ভাল না। হয়ত একটু আগে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি বলে এরকম মনে হচ্ছে।

'কখন ফিরবেন?'

'জানি না কখন ফিরবে। ভাইয়ার সঙ্গে আপনার কি দরকার?'

'উনি আপনার ভাই?'

'হুঁ। আপনার প্রয়োজনটা কি?'

'একটা খবর ছিল।'

'কি খবর?'

'আড়ালে বলতে চাই।'

আমি হকচকিয়ে গেলাম। আড়ালে বলতে চাই মানে? এমন কি খবর লোকটার কাছে আছে যা সে আড়ালে বলতে চায়? তাছাড়া এখন আমাদের আশে পাশে কেউ নেই। এরচে আড়াল কি হতে পারে?

'খবর টা আপনার পিতা সম্পর্কে।'

'বলুন ।'

'উনি কোথায় আছেন আমি জানি।'

'বলুন কোথায় আছেন।'

'নারায়নগঞ্জে থাকেন। একটা বিবাহ করেছেন। তাঁর একটা কন্যা সন্তান আছে।'

'আপনি কে?'

'আমি কে তা দিয়ে আপনার প্রয়োজন কি? আমার খবর সত্য। আমি রঞ্জু সাহেবকে খবর দিয়েছিলাম তিনি বিশ্বাস করেন নাই। গালাগালি করেছেন। কিন্তু খবর সত্য।'

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এবং এই প্রথম বুঝলাম যে আমি আসলে খুব শক্ত নার্ভের মেয়ে। অন্য কেউ হলে হৈ চৈ শুরু করে দিত। আমি কিছুই করলাম না। চুপচাপ লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচাচ্ছে।

'আপনার পিতা যাকে বিবাহ করেছেন তার নাম সরজুবালা। হিন্দু মেয়ে। বিবাহ হয়েছে চার বছর আগে।'

'এই সব খবর আপনি আমাকে দিচ্ছেন কেন? আপনার উদ্দেশ্য কি?'

লোকটা বিড়ি ধরাল। উৎকট গন্ধ। ঢাকা শহরে আমি কাউকে বিড়ি খেতে দেখিনি। ঢাকা শহরের রিকশাওয়ালারা পর্যন্ত সিগারেট খায়। এই লোকটা বিড়ি টানছে। আমি কঠিন গলায় বললাম, আপনার উদ্দেশ্য কি?

আমি সামনের মাসের এক দুই তারিখে আবার আসব। তিন হাজার টাকা জোগাড় করে রাখবেন। আমি আপনাদের ঠিকানা দিব।

'আপনার নিজের ঠিকানা কি?'

'আমার নিজের কোন ঠিকানা নাই। আপনারা টাকা জোগাড় করে রাখবেন। সামনের মাসের এক দুই তারিখে আসব।'

লোকটা চলে যাবার পর আমি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মা'র ঘরে ঢুকলাম। মা ঘুমুচ্ছেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ছোট খাট একজন মহিলা। তাঁর চোখের কোনে পানির দাগ। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি মা'র ঘর থেকে আপার ঘরে ঢুকলাম। আপা বলল,

'কার সঙ্গে কথা বলছিলি?'

'কারো সঙ্গে না। এক লোক ঠিকানা জানতে চাচ্ছিল।'

'ও আচ্ছা। চা খাওয়াতে পারবি রেনু?'

'পারব।'

আমি চা বানিয়ে নিয়ে এসে দেখি আপা শাড়ি পাল্টাচ্ছে। চুল বেঁধেছে। আপাকে লাগছে ইন্দ্রানীর মত। আমি বললাম, কোথাও যাচ্ছ?'

'হুঁ।'

'কোথায়?'

'আমার এক বান্ধবীর জন্মদিনে।'

আপা চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। আমি তাকিয়ে আছি মুগ্ধ চোখে। এই সামান্য সাজেই কি সুন্দর যে আপাকে লাগছে। আল্লাহ্ কিছু কিছু মানুষকে এত সুন্দর করে কেন বানান?

'রেনু আমি কি ঠিক করেছি জানিস? এখন থেকে সব বান্ধবীর জন্মদিনে যাব। বিয়ের অনুষ্ঠানে যাব। তাতে লাভ কি হবে জানিস কারোর না কারোর চোখে পড়ে যাব। আমার এখন খুব দ্রুত বিয়ে হওয়া দরকার। ভাইয়ার মাথা খারাপ হবার বেশি দেরী নেই। পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়ে গেলে আমার আর বিয়ে হবে না। সুন্দরী মেয়ে বিয়ে না হওয়া মানে ভয়াবহ সর্বনাশ।'

'মাঝে মাঝে তুমি খুব স্বার্থপরের মত কথা বল আপা।'

'স্বার্থপরের মত না। আমি বুদ্ধিমতী মেয়ের মত কথা বলি। রূপবতীদের বুদ্ধিমতী হওয়াতে বাধার কিছু নেই। এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হলে আমাদের অবস্থা কি হবে কখনো ভেবেছিস?'

'কিছু একটা হবেই।'

'কিছুই হবে না রেনু। যত দিন যাবে অবস্থা ততই জট পাকিয়ে যাবে। ঐ যে লোকটা তোকে বলল, বাবার খোঁজ পাওয়া গেছে। দেখা যাবে সেটাও সত্যি।'

আমি চমকে উঠে বললাম, তুমি কথা শুনেছ?

'শুনব না কেন? আমি তো বধির না। আমার কান খুব পরিস্কার। ভাইয়ার সঙ্গে লোকটার যে কথা হয় তাও শুনেছি।'

'কিছুতো বলনি।'

'বলব কেন? আগে বাড়িয়ে আমি কিছু বলি না।'

'তোমার কি ধারণা লোকটা সত্যি কথা বলছে?'

'না — মিথ্যা বলছে। বিরাট ফ্রড বলেই টাকা চাচ্ছে। তবে সব মিথ্যার সঙ্গে খানিকটা সত্যি থাকে। এ্যাবসলিউট ট্রুথ বলে যেমন কোন জিনিস নেই; এ্যাবসলিউট ফলস বলেও কিছু নেই।'

আপা উঠে দাঁড়াল। আমাকে বলল, তুই আমার সঙ্গে রাস্তার মোড় পর্যন্ত

আয়। চায়ের দোকানের কয়েকটা ছেলে আমাকে খুব বিরক্ত করে। একা একা যেতে ইচ্ছা করে না।

আমি আপার সঙ্গে যাচ্ছি। আপা বলল, আয় আমরা হাত ধরাধরি করে হাঁটি। আমি আপার হাত ধরলাম। আপা গলার স্বর নীচু করে বলল, রেনু আমি প্রচন্ড আতংকের মধ্যে বাস করি।

'কেন?'

'আমার সারাক্ষণই মনে হয় শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্য হবে আভার মত। সন্ধ্যাবেলায় সেজেগুজে সংসদ ভবনের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে হবে যাতে কোন পুরুষ মানুষ দয়া করে এগিয়ে আসে।'

'তুমি এসব কি বলছ আপা?'

'না জেনে বলছি না রেনু। জেনেই বলছি। আভার সঙ্গে আমার একদিন দেখা হয়েছিল। সব সে খুলে বলল — কিছুই গোপন করল না। অসাধারণ একটা মেয়ে। ওর ঠিকানা আছে আমার কাছে। আমি কি ঠিক করেছি জানিস একদিন একগাদা গোলাপ ফুল নিয়ে আভার বাসায় উপস্থিত হব।'

'কেন?'

'একটা অসাধারণ মেয়ে। ফুল ছাড়া ওর কাছে যাওয়া যায় না। রেনু একটা কথা বলি, তোর কাছে যে লোকটা এসেছিল খবদার ভাইয়াকে এই সম্পর্কে কিছু বলবি না। বেচারা এমিতেই নানান সমস্যায় অস্থির হয়ে আছে। ওকে আর জড়ানো ঠিক হবে না।'

ভাইয়াকে আমি কিছুই বললাম না। খুব স্বাভাবিক আচরণ করতে লাগলাম। হৈ চৈ গল্প গুজব আগের চেয়ে আরো বেশি করলাম। ভাইয়া কোত্থেকে দড়ি কাটার এক ম্যাজিক শিখে এসেছে। ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে ধরা খেয়ে গেল। আমরা খুব হাসাহাসি করতে লাগলাম। আমাদের দেখে কে বলবে যে আমাদের কোন দুঃখ কষ্ট আছে।

আপার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে একদিন গেলাম আভাকে দেখতে। আভা ঘরেই ছিল। আমাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল — ও আল্লা রেনু, রেনু। মা দেখ দেখ রেনু এসেছে, রেনু। যেন আমি বিরাট বড় এক স্টার। আমার এ বাড়িতে আসা যেন ইতিহাসের বই এ লিখে রাখার মত ঘটনা।

'কেমন আছ রেনু?'

'ভাল আছি।'

'তোমার ভাইয়া কেমন আছে?'

'ভাল আছে।'

'ও এখন শুধু পাগলদের সঙ্গে ঘুর ঘুর করে তাই না?'

'হুঁ।'

'আমি দু'দিন দেখেছি। দু'দিনই পাগলের সাথে। একদিন দেখি সে এক পাগলের গলা জড়িয়ে ধরে হাঁটছে। প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলালাম। আমি ওর সামনে পড়তে চাই না।'

'কেন চান না?'

আভা হাসতে হাসতে বলল, এক সময় আমার অনেক স্বপ্ন ছিল রেনু। এখন স্বপ্ন টপ্ন নেই। তোমার ভাইয়ের দরকার স্বপ্ন আছে, এমন একটি মেয়ে। আমাকে দেখলে সে আবার আটকে যাবে। কাজেই তোমার যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এই খবর তুমি চেপে যাবে এবং চেষ্টা করবে যেন দুলু নামের মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মনে থাকবে?

আমি জবাব দিলাম না।

আভা ক্লান্ত গলায় বলল, পুরুষ মানুষ সম্পর্কে আমার মোহভঙ্গ হয়েছে রেনু। আমি আর কোনদিন কোন পুরুষকে বিয়ে করে সুখি হতে পারব না। মাকড়সা দেখলে আমাদের যেমন ঘেন্নায় শরীর কেমন করতে থাকে, পুরুষ মানুষ দেখলেও আমার এমন হয়। যাক এসব কথা, রেনু তোমার চোখ কিন্তু আরো সুন্দর হয়েছে। কোন কথা না বলে তুমি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাক তো।

আভা আপার বাসা থেকে ফিরবার পথে আমার কেন জানি মনে হল ঐ মানুষটার সঙ্গে আমার দেখা হবে। দেখা হবেই। এবং অল্প কিছু সময় তিনি যদি আমার সঙ্গে কথা বলেন তাহলে আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে। আমার মনে হতে লাগল তিনিও আভা আপার মত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে বলবেন, আরে তোমার চোখ দু'টিতো ভারি সুন্দর।

আমি ঐ রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। সন্ধ্যা মিলিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। গুন্ডাধরণের এক ছেলে আমার কাছে এসে বলল, এই যে আপামনি অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করছেন। কেইস কি?

আমি বাসায় ফিরলাম। রিকশা করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরলাম। কেন কাঁদছিলাম নিজেও জানি না। রিকশাওয়ালা দরদ মাখা গলায় বলল, কি হইছে আপনের? কি হইছে?

কি যে আমার হয়েছে তা কি আমি নিজেই জানি?

৭

বাসা ছেড়ে দেয়ার জন্যে যে একমাস সময় দেয়া হয়েছিল সেই একমাস সাতদিন আগে পার হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে কেউ কিছু বলছে না। সুলায়মান চাচার তিন মেয়ে এবং তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে আমাদের বেশ কবার দেখা হয়েছে। তাঁরা আমাদের কিছু বলেন নি। সবাই এমন ভাব করেছেন যেন আমাদের দেখতে পান নি। কোন বিচিত্র কারণে আমরা অদৃশ্য হয়ে আছি। সামনে থাকলেও আমাদের দেখা যায় না। রহস্যটা কি আমরা বুঝতে পারছি না। তবে সবাই এক ধরনের অনিশ্চয়তায় ভুগছি। না সবাই না। ভাইয়া কোন কিছুতে ভুগছে না। সে তার জাপানী ভাষা নিয়ে ব্যস্ত। তার জাপানী ভাষার ফাইনাল পরীক্ষা। পাশ করলে সার্টিফিকেট পাবে। তার ধারণা একজন পাশ করলেও সে পাশ করবে। সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে এখন সে জাপানী পড়ছে।

খাবার টেবিলেও জাপানী ভাষা ছাড়া অন্য কোন কথা বলছে না।

'বুঝলি খুকী, আমরা যেমন এক দুই করে জিনিস গুনি জাপানীরা তাই করে। তবে একেক রকম জিনিসের জন্যে একেক ধরনের এক দুই ব্যবহার করে। জাতি হিসেবে এরা খুব পাগলা।'

'তোমার কথা কিছুই বুঝলাম না।'

'সমতল জিনিস, যেমন — রুমাল, তক্তা এইসব গোনার জন্যে তাদের এক রকম সংখ্যা। এক হল ইচিমাই, দুই হল নিমাই, তিন হল সানমাই। আবার জন্তু এবং মাছ গোনার জন্য অন্য রকম সংখ্যা। এক হল ইপপিকি, দুই হল নিহিকি, তিন হল সানবিকি। লম্বা জিনিস যেমন — কলম, কলা, ছাতা এগুলি গোনার জন্য অন্য রকম সংখ্যা। এক হল ইপপোন, দুই হল নিহোন, তিন হল সানবোন।'

'পাগল না–কি?'

'অফকোর্স পাগল। ওরা যখন শুনে আমরা সব কিছু গোনার জন্যে এক দুই ব্যবহার করি তখন ওরাও চোখ কপালে তুলে বলে — পাগল না–কি হা–হা–হা।'

মা এবং আপা কেউই ভাইয়ার এই সব আলাপে অংশ গ্রহণ করে না। আপা মাঝে মধ্যে কিছু বললেও মা কখনো বলেন না। ভাইয়ার সঙ্গে তাঁর ঠাণ্ডা যুদ্ধ

চলছে। ভাইয়া বেশ ক'বার মিটমাটের চেষ্টা করেছে, লাভ হয়নি। মা আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। বলা যেতে পারে বাসার পরিস্থিতি খুবই অস্বাভাবিক।

আপার টিচার তার দুই বন্ধুকে নিয়ে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ গল্প-টল্প করলেন। চা খেলেন। ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য প্রশ্ন করলেন। উত্তর যা পেলেন তার কোনটিই তাদের পছন্দ হল না। কিছু কিছু উত্তর শুনে রীতিমত ভড়কে গেলেন। প্রশ্নের উত্তর বেশীর ভাগই দিল ভাইয়া। সে না দিয়ে যদি আমি দিতাম তাহলে হয়ত বা কিছুটা সামলে দিতাম। ভাইয়া সে সুযোগ দিল না। প্রশ্ন-উত্তরগুলি এরকম ঃ

স্যার ঃ এই বাড়ি কি আপনাদের নিজের?

ভাইয়া ঃ পাগল হয়েছেন। ভাড়া বাড়ি। তাও অনেকদিন ভাড়া দেয়া হচ্ছে না। যে কোন মুহূর্তে বের করে দেবে।

স্যার ঃ গ্রামের বাড়িতে নিশ্চয়ই জমিজমা আছে?

ভাইয়া ঃ কিছুই নেই। সামান্য ছিল, বাবা তা বিক্রি করে ক্যাশ টাকা করেছিলেন ব্যবসার জন্যে। পাটের ব্যবসায় লাগানো হয়েছিল — লাভ হয়নি। আমও গেছে ছালাও গেছে।

স্যার ঃ আপনার বাবা ব্যবসা করেন?

ভাইয়া ঃ বাবা যা করেন তাকে ব্যবসা বলা ঠিক হবে না। তাতে ব্যবসা শব্দটার অমর্যাদা হবে। বাবাকে ভদ্র ফেরিওয়ালা বলতে পারেন। তিনি এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় আনেন।

স্যার ঃ ইনি কি আছেন বাসায়?

ভাইয়া ঃ না, উনি যে কোথায় আছেন আমরা জানি না। চার মাস ধরে বাড়ির সঙ্গে কোন যোগ নেই।

স্যার ঃ (পুরোপুরি ঘাবড়ে গিয়ে) কেন?

ভাইয়া ঃ বুঝতে পারছি না। সম্ভবত আমাদের পছন্দ করেন না।

এজাতীয় বাক্যালাপের পর বিয়ের কথা একশ' হাত পানির নীচে চলে যাওয়ার কথা। গেলও তাই। ভদ্রলোক শুকনো মুখে চলে গেলেন।

আপা বলল, আবার আসবে। এক সপ্তাহের মধ্যে আসবে। কোন জায়গায় কিছু ঠিক করতে না পেরে আসবে।

'ঠিক করতে পারবে না কেন?'

'চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝিস না কেন? ঘোড়ার মত মুখ। এই চিজকে কে শখ করে বিয়ে করবে? আমার কাছে আবার আসা ছাড়া গতি নেই। আবার আসবে। শেষ মুহূর্তে আসবে।'

'যদি আসে তুমি রাজি হবে?'

'জানিনা, হয়ত হব। এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না। পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। ঘোড়া টাইপ একটা ছেলেকে বিয়ে না করলে পালানো যাবে না।'

'তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?'

আপা সরু চোখে তাকাল।

সে আরো সুন্দর হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই সুন্দর হচ্ছে। এটাও আমাদের জন্যে ভয়ের কথা। সুন্দরী মেয়েদের সমস্যার অন্ত নেই। বাসার সামনে আজে বাজে ধরণের কিছু ছেলে এখন জটলা পাকায়। এর মধ্যে একজনকে দেখলে ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সে মোটর সাইকেলে চড়ে আসে। মাথা ভর্তি বাবড়ি চুল। চোখ সানগ্লাসে ঢাকা। সে একা আসে না। তার কোমর জড়িয়ে ধরে আরেকজন বসে থাকে। সেই জন রোগা টিঙ টিঙে। সম্ভবত চামচা টাইপের কেউ। চোখে সানগ্লাসওয়ালা মোটর সাইকেল থেকে নেমে পা ফাঁক করে দাঁড়ায়। চামচাটা পান এনে দেয় সিগারেট এনে দেয়। পাশে দাঁড়িয়ে হ্যা হ্যা করে হাসে।

আমাদের বাসটাই যে এদের লক্ষ্য তা অত্যন্ত পরিস্কার। কারণ এরা তাকিয়ে থাকে আমাদের বাসার দিকে। কোন কোন দিন দু'টা মোটর সাইকেলে করে চারজন এসে উপস্থিত হয়। এরা কখনো বসে না। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে। সম্ভবত দাঁড়িয়ে থাকাটাই স্টাইল। এক বিকেলে সানগ্লাসওয়ালা আমাদের বাসার কড়া নাড়ল । আমি দরজা খুললাম। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে বললাম, কি চান?

সানগ্লাসওয়ালা বলল, আগুন দরকার। দেয়াশলাই আছে?

আমি দেয়াশলাই এনে দিলাম। সে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, মীরা কি বাসায়?

'হ্যাঁ বাসায়, কেন?'

'না এম্নি জিজ্ঞেস করলাম।'

সে লম্বা লম্বা পা ফেলে মোটর সাইকেলের দিকে রওনা হল। আমি বললাম, দিয়াশলাই দিয়ে যান।

'ও সরি, ক্যাচ ধরতো।'

বলে দূর থেকে দেয়াশলাই ছুড়ে দিল। তার সঙ্গীরা হেসে উঠল । আমি কঠিন মুখ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। এর বেশী আমার আর কি বা করার আছে। আমাদের পাশের বাড়ির ভাড়াটের স্ত্রী একদিন এসে কথায় কথায় আমার মা'কে বললেন — আপা বড় মেয়েটাকে আপনি তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিন।

মা বললেন, কেন?

'সবাই কি সব বলাবলি করে, শুনে ভয় লাগে শেষটায় যদি কোন কেলেংকারী হয়।'

'কি বলাবলি করে?'

'গুণ্ডা টাইপের ছেলে রোজ আসে। এদের বিশ্বাস নেই। ধরুন খালি বাসায় এরা যদি কোন দিন এসে মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তখন কি করবেন? এরকমতো হচ্ছে আজকাল। খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায় — অপহরণ, ধর্ষন। আপা, আপনি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করুন কিংবা দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিন।'

এ জাতীয় কথায় আতংকগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। আমরা আতংকগ্রস্ত হই। কিন্তু ভাইয়া নির্বিকার। সে হাসতে হাসতে বলল, যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে তাদেরকে ভয়ের কিছু নেই। এরা হার্মলেস ভেজিটেবল। কাজকর্ম নেই বলে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি ভাইয়াকে বললাম, তুমি তাদের কিছুই বলবে না?

'কিছু বললে ওদের গুরুত্ব দেয়া হবে। এরা এটাই চাচ্ছে। কিছু না বলাই ভাল।'

'ওদের কাণ্ডকারখানা আমার কিন্তু ভাল লাগছে না। ওরা কোন একটা মতলব করছে।'

'মানুষের বাড়ির সামনে পা মেলে দাঁড়িয়ে কেউ মতলব করে না। তুই খামাখা চিন্তা করিস নাতো। চিন্তা করে কখনো কোন সমস্যার সমাধান হয় না।'

'অতি তুচ্ছ সব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার কোন মানে হয় না। আমাদের সামনে বিশাল সমস্যা।'

'বিশাল সমস্যাটা কি?'

'যথাসময়ে জানতে পারবি।'

'এখনি বল।'

ভাইয়া হাসতে হাসতে বলল, মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাচ্ছি। ছোট খাট সব লক্ষণ আমার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। রাস্তায় নামলেই পরিচিত লোকজনদের দেখি — যারা আসলে ত্রিসীমানায় নেই । যেমন গতকাল রেসকোর্সের পাশের রাস্তা দিয়ে

যাচ্ছি — পাবলিক লাইব্রেরীর দিকে, কি মনে করে ডান দিকে তাকালাম, দেখি সুলায়মান চাচা। রেসকোর্সের ভেতর একটা গাছের নীচে বসে আছেন।

'কি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ তাই। বসে বসে বাদাম খাচ্ছেন। আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছেন। প্রচণ্ড একটা শক খেলাম — ছুটে গেলাম, দেখি সুলায়মান চাচা না। অন্য একজন।'

'এটাতো ভাইয়া এমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার না।'

'একবার ঘটলে অস্বাভাবিক না। বার বার ঘটলেই অস্বাভাবিক। আমি আভাকে দেখেছি তিনবার। অথচ কোন বারই আভা ছিল না। ছিল অন্য মহিলা। একবার দেখলাম আভা রিকশা করে যাচ্ছে — আমাকে দেখে ডাকল — এ্যাই এ্যাই। আমি রাস্তার ওপাশে ছিলাম, দৌড়ে পার হলাম — আরেকটু হলে একটা টেম্পোর নীচে পড়তাম। যাই হোক রাস্তা পার হয়ে দেখি অন্য মেয়ে। তারপর বাবার কথা ধর — বাবাকেতো প্রায়ই দেখি।'

আমি ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। সে সহজ গলায় বলল, নানান ঝামেলা এবং যন্ত্রণায় ব্রেইন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া পাগলের সঙ্গে সব সময় ঘোরাঘুরি করি — সেটাও একটা ব্যাপার।

'এখনও পাগলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি কর?'

'হুঁ। করি। মানুষ হিসেবে এরা অসাধারণ। অতি ভদ্র। আমি ওদের সঙ্গে জাপানী ভাষায় কথা বলি। ওরা এমন ভাব করে যেন কথা বুঝতে পারছে। কিছু কিছু আবার বুঝতেও পারে।'

'ভাইয়া চুপ করতো?'

'আচ্ছা যা চুপ করলাম।'

'চা খাবে? চা বানিয়ে আনব?'

'নিয়ে আয়।'

'আজ তুমি বেরুবে না?'

'না। শরীরটা ভাল লাগছে না।'

চা এনে দেখি ভাইয়া চাদর গায়ে ঘুমুচ্ছে। তার গায়ে জ্বর। বেশ ভাল জ্বর।

বিকেলে জ্বর গায়েই সে বেরুল। টিউশানি আছে। ছাত্রের পরীক্ষা। টিউশানি মিস করলে সমস্যা হবে। ছাত্রের মা ভয়ংকর কড়া। এই টিউশানি হাত ছাড়া করা যাবে না। এরা টাকা ভাল দেয়। আমি বললাম, তুমি আমাকে ঠিকানা দাও ভাইয়া — আমি পড়িয়ে আসি। জ্বর গায়ে তুমি বেরুতে পারবে না।

ভাইয়া হাসতে হাসতে বলল, জ্বরকে পাত্তা দিলে জ্বর মাথায় চড়ে বসবে। অসুখ বিসুখ হলে এদের অগ্রাহ্য করতে হয়। অগ্রাহ্য করলে এরা লজ্জায় পালিয়ে যায়। এদের লজ্জা বেশী।

ভাইয়া রাতে প্রবল জ্বর নিয়ে ফিরল। কয়েকবার বমি করে নেতিয়ে পড়ল। আমি এবং আপা সারারাত জেগে রইলাম। মা দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন — ভেতরে ঢুকলেন না। আশ্চর্য! এখনো তাঁর রাগ পড়ে নি। ঘরে থার্মোমিটার নেই, তাপ কত দেখতে পারছি না। ভাইয়া আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আছে। মাঝে মাঝে চোখ মেলে তাকাচ্ছে। টকটকে লাল চোখ। ঠোঁট শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে কিন্তু মুখ হাসি হাসি।

আপা বলল, ভাইয়া কেমন লাগছে?

ভাইয়া বলল, 'কামিনারি দে দেন্‌তোও গা কিএমাশিতা।'

'এর মানে কি?'

'মানে হচ্ছে — বজ্র পড়ায় বাতি নিভে গেলো।'

'ঘুমুতে চেষ্টা কর তো ভাইয়া।'

'চেষ্টা করছি, লাভ হচ্ছে না। পৃথিবী যে নিজের অক্ষের উপর ঘুরে এই ব্যাপারটা আগে বিশ্বাস করিনি। এখন করছি। আমার চারদিক বন বন করে ঘুরছে। জয় বিজ্ঞান।

আমি বললাম, চুপচাপ শুয়ে থাক।

ভাইয়া হাসতে হাসতে বলল, শুয়েই তো আছি দাঁড়িয়ে আছি নাকি?

শেষ রাতের দিকে ভাইয়ার জ্বর একটু নামল, সে বিছানায় উঠে বসল। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, খুব ট্রাবল দিয়েছি এখন ঘুমুতে যা।

'শরীর ভাল লাগছে?'

'খানিকটা লাগছে। মা কি জেগে আছে?'

'হুঁ। বারান্দায় বসে আছেন।'

'মা'কে ডেকে আন তো। মা'র রাগ ভাঙ্গাবার ব্যবস্থা করি।'

মা ঘরে এলেন। ভাইয়া বলল, বসো মা।

মা বসলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর স্বাস্থ্য যে এতটা খারাপ হয়েছে আগে লক্ষ্য করিনি। ছায়ার মত একজন মানুষ। ভাইয়া হাত বাড়িয়ে মা'র হাত ধরল। মা'কে টেনে পাশে বসিয়ে বলল, বাবা কোথায় আছেন এই সম্পর্কে অনেক চিন্তা

ভাবনা করে একটা থিওরী বের করেছি। তোমাকে বলি শোন — বাবার একটা চিঠির কথা তোমার মনে আছে? যেখানে বেনাপোল বর্ডার দিয়ে সুপারি আসার কথা লেখা, ঐ চিঠি থেকে আমার ধারণা হয়েছে — বাবা বেনাপোল গিয়েছিলেন। তারপর লোভে লোভে বর্ডার ক্রস করেছেন। ব্যবসার জন্যেও যেতে পারেন আবার দেশ দেখার জন্যেও যেতে পারেন। তাঁর তো ঘোরার বাতিক আছে। ঐখানে ইণ্ডিয়ান পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। তারা বাবাকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। খবরের কাগজে দেখেছি কোলকাতার জেলে সত্তুর জনের মত বাংলাদেশী আছে। বিনা পাসপোর্টে যারা যায় তাদের ছ'মাসের মত জেল হয়। ছ'মাস প্রায় হতে চলল। আমার ধারণা, বাবার ফিরে আসার সময় হয়েছে।

আমরা সবাই হতভম্ভ হয়ে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে আছি।

ভাইয়া বলল, আমি কোলকাতায় খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছি। লাভ হয়নি। নিজেই যাব। পাসপোর্ট করেছি। এই দেখ পাসপোর্ট।

ভাইয়া তোষক উল্টে পাসপোর্ট বের করল।

'মা শোন, তুমি যে ভাব, বাবার ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, এটা ঠিক না। আমার কোন বন্ধুবান্ধব নেই মা। বাবা ছিলেন বন্ধুর মত। তুমি যতটুকু আগ্রহ নিয়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করছ আমি তার চেয়ে কম আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি না। বাবা একদিন ফিরে আসবে এবং হাসতে হাসতে বলবে —"ফানি ম্যান, ভেরী ফানি ম্যান।" এটা শোনার জন্যে আমি কতটুকু ব্যস্ত তা তুমি কোনদিন বুঝবে না। আমি জ্বরে মরে যাচ্ছিলাম, তুমি দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলে। একবার ভেতরেও ঢুকলে না। তোমার এই অপরাধ আমি কোনদিন ক্ষমা করব না বলে ভেবেছিলাম, মত পাল্টেছি। তোমাকে ক্ষমা করা হল। এখন তুমি ঘুমুতে যাও মা। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

মা ঘর থেকে চলে যাবার পর পর আমি বললাম, তুমি যে কথাটা বললে তা কি নিজে বিশ্বাস কর?

ভাইয়া রাগী গলায় বলল, বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস না করলে পাসপোর্ট করিয়েছি শুধু শুধু?

আমি নীচু গলায় বললাম, আমার কাছে একটা লোক এসেছিল সে . . .

ভাইয়া আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, চুপ কর। পাগলের মত কথা বলবি না! একজন একটা কথা বললেই বিশ্বাস করতে হবে?

'সত্যি হতেও তো পারে।'

ভাইয়া চোখ লাল করে বলল, যা তুই আমার সামনে থেকে। গেট আউট। গেট আউট।

মা ভাইয়ার চিৎকার শুনে ছুটে এসে বললেন, কি হয়েছে।

ভাইয়া হাসি মুখে বলল, কিছুই না। রেনুকে একটা হিটলারী ধমক দিয়ে দেখলাম — ধমক দিতে পারি কি — না। ভাল কথা মা তোমাদের বলতে ভুলে গেছি আমার একটা চাকরি হচ্ছে। দুলুর বাবা, মন্ত্রী সাহেব নিজেই আমাকে ডেকে চাকরি দিতে চেয়েছেন। ভাল একটা খবর ভেবেছিলাম চাকরি পাবার পর দেব। আগে ভাগেই দিয়ে ফেললাম। এখন দয়া করে একটু হাস মা। অনেকদিন তোমার মুখের হাসি দেখি না।

দ্বিতীয় দিনে ভাইয়ার জ্বর দুপুর বেলার দিকে খুব বাড়ল। একবার বমি করল। বমির সঙ্গে টাটকা রক্ত। আমি হকচকিয়ে বললাম, রক্ত কেন?

ভাইয়া বলল, টনসিল থেকে রক্ত আসছে। খামাখা মুখ এরকম করিস না। জ্বর নেমে যাচ্ছে।

সত্যি সত্যি বিকেলের দিকে জ্বর নেমে গেল।

ভাইয়ার অসুখের কথা কাউকে আমরা বলিনি কিন্তু দুলু আপা কোত্থেকে যেন খবর পেয়ে চলে এলেন। একবার ভাইয়ার ঘরে উঁকি দিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

'অনেকদিন তুই আমাদের বাসায় আসিস না। কারণটা কি বল তো?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, মন্ত্রীর বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে না। তবু একদিন গিয়েছিলাম। গেটে পুলিশ ধরল। হেন তেন কত প্রশ্ন। কার কাছে যাবেন? কেন যাবেন? শেষে রাগ করে চলে এসেছি।

দুলু আপা প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, দু'দিন পর পর তোর ভাইয়ার জ্বর হয় কেন বল তো?

'জানি না।'

'অকারণে রোদে ঘোরাঘুরি করে। জ্বর হবে না তো কি? আমি দু'দিন দেখেছি, ঝাঁঝাঁ রোদে হাঁটছে। সঙ্গে পাগল ধরনের একজন মানুষ।'

'পাগল ধরনের না আপা। সত্যিকারের পাগল। ভাইয়া আজকাল পাগল ছাড়া কারো সঙ্গে মেশে না। তোমার সঙ্গে ভাইয়ার খুব ভাল মিল হবে। তুমিও পাগল।'

দুলু আপার মুখ টকটকে লাল হয়ে গেল — খানিকটা লজ্জায়, খানিকটা আনন্দে।

পৃথিবীর সবচে' সুন্দর দৃশ্য হচ্ছে একটি মেয়ের লম্বা ও আনন্দ মেশানো লালচে মুখ। দুলু আপার দিকে তাকিয়ে থাকতে এত ভাল লাগছে।

আমি বললাম, আপা তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে ওটা কি সত্যি?

'মোটেই সত্যি না। আরেকটা কথা তোকে বলি — তুই যে আমাকে একবার বলেছিলি চিঠি লিখতে। আমি ঠিক করেছি লিখব।'

'খুব ভাল করেছ। আমার কাছে দিও। পৌঁছে দেব

'তোকে পৌঁছাতে হবে না। আমার চিঠি আমিই পৌঁছাব।'

আমি বললাম, ভাইয়া জেগে আছে। আপা তুমি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করবে?

দুলু আপা দ্বিতীয়বার লজ্জায় লাল হয়ে বললেন, না। আমি যাই রেনু। তোর ভাইয়ার জ্বর বাড়লে আমাকে খবর দিস। মন্ত্রীর মেয়ে বলে অবহেলা করিস না।

ভাইয়ার জ্বরের তৃতীয় দিনের কথা। মা ঘরে নেই – তাঁর এক মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছেন সম্ভবত টাকা ধার করতে গেছেন। ঘরে একটি টাকাও নেই। আমিও আমার অভ্যাস মত ঘুরতে বের হয়েছি। হাটাহাঁটি করছি ঐ রাস্তায় যদি মবিনুর রহমান নামে মানুষটির দেখা পেয়ে যাই। একদিন না একদিন দেখা তো হবেই। এই দিকেই কোথাও তাঁর বাসা। এই রাস্তাতেই তাঁকে যাওয়া আসা করতে হয়। হাল ছেড়ে ঘরে বসে থাকার কোন মানে হয় না।

বাসায় আছে শুধু আপা একা। ভাইয়ার বেশ জ্বর। সে এই জ্বর নিয়েই আপার সঙ্গে হাসি তামাশা করছে। এক সময় বলল, মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ — গাল চুলকাচ্ছে — মীরা, রেজারটা এনে দে, দাড়ি কামাব। আর শোন্ আমার টু-ইন-ওয়ান আয়নাটাও আন্ তো।

আপা রেজার এবং সাবান এনে দেখে ভাইয়া খাটের নীচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। আপা দরজা খুলে ছুটে বের হয়ে এল। কাঁদতে কাঁদতে সানগ্লাস পরা ছেলেটার কাছে গিয়ে বলল – আমার ভাইয়া মরে যাচ্ছে। আমার ভাইয়া মরে যাচ্ছে।

সানগ্লাস পরা ছেলে অসাধ্য সাধন করল। একা ভাইয়াকে কোলে নিয়ে বের হয়ে এল। বেবীটেক্সি করে নিয়ে গেল হাসপাতালে। হাসপাতালে আপা ক্রমাগত কাঁদছিল। ছেলেটা আপাকে প্রচন্ড ধমক দিল — কান্নাকাটি করার এখন সময়? বিপদের সময় কান্নাকাটি — একেবারে অসহ্য। চুপ করেন তো।

ডাক্তাররা ভাইয়ার অসুখ ধরতে পারলেন না। তাঁদের চেষ্টার কোন ত্রুটি অবশ্যি হল না। কারণ দুলু আপার বাবা (সেচ ও যোগাযোগ মন্ত্রী) দু'বার এসে রুগীকে দেখে গেছেন। তাঁর নির্দেশে রুগীকে জেনারেল ওয়ার্ড থেকে কেবিনে নেয়া হয়েছে। চিকিৎসার জন্যে একটা মেডিকেল বোর্ড তৈরী করা হয়েছে।

দুলু আপা সারাক্ষণ আছেন ভাইয়ার পাশে। কোন রকম সংকোচ নেই। রুগীর গা স্পঞ্জ করতে হয়। দুলু আপা অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বলেন, দেখি তোয়ালেটা আমার কাছে দাও তো। আমি গা স্পঞ্জ করে দিচ্ছি। ভাইয়া লাল চোখে দুলু আপার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন — কে আভা নাকি ? মাই গড, তুমি কোত্থেকে খবর পেলে? আমি তোমাকে খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা করেছি। তুমি কোথায় ডুব দিয়েছিলে বল তো?

দুলু আপা কিছুই বলেন না। চুপ করে থাকেন। তাঁর চোখ মমতা ও বেদনায় ছল ছল করে।

৮

ভাইয়া মারা গেল উনিশ দিনের দিন। সে কমায় চলে গিয়েছিল, শেষের পাঁচদিন আশে পাশের জগৎ সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। মৃত্যুর আগে আগে পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেল। দুলু আপাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল — আরে দুলু তুমি ! তুমি এখানে কি করছ?

দুলু আপা সবাইকে অগ্রাহ্য করে কাছে এগিয়ে গেলেন। ভাইয়ার হাত ধরে বিছানার কাছে বসলেন। ভাইয়া অস্বস্তি এবং লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। সে তাকাতে লাগল আমাদের দিকে। একটু চেষ্টাও করল হাত ছাড়িয়ে নিতে। তার কিছুক্ষণ পর ভাইয়ার মৃত্যু হল। আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বারান্দায় সানগ্লাস পরা ছেলেটি একা একা দাঁড়িয়ে। তার চোখে আজ সানগ্লাস নেই। সে কাঁদছে। ময়লা রুমালে ক্রমাগত চোখ মুছছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আমার ভাই — 'ফানি ম্যান' আজ মারা গেছে। সে তো কাঁদবেই। সে একা কেন সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে আজ চিৎকার করে কাঁদতে হবে। শুধু আমি কাঁদব না। আমি কিছুতেই কাঁদব না। আমি রাস্তায় রাস্তায় সুখী মেয়ের মত ঘুরে বেড়াব।

ভাইয়ার ঘর থেকে বের হয়েই দেখি বারান্দায় রেলিং ধরে আভা দাঁড়িয়ে আছে। আপা তাকে খবর দিয়ে এনেছে। সে ঘরে ঢুকে নি। দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। আমাকে দেখে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, আমার ভাইয়া ফানি ম্যান রঞ্জু মারা গেছে।

আভা কিছুই বলল না। ঘরে ঢুকল না বা উঁকি দিয়ে দেখল না — ক্লান্ত পায়ে হাসপাতালের লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল। আভার গায়ে আকাশী রঙের শাড়ি। এই শাড়ি সে ইচ্ছা করেই পরে এসেছে। ফানি ম্যান রঞ্জুর নীল শাড়ি খুব পছন্দ। কে জানে কোন এক উপলক্ষে এই নীল শাড়ি হয়ত সেই আভাকে কিনে দিয়েছে।

এই পৃথিবী পরম রহস্যময়। হাসপাতাল থেকে রাস্তায় নামমাত্র আমি যে মানুষটিকে এতদিন ধরে খুঁজছি তাঁর দেখা পেলাম। তিনি প্রথম দিনের মত রিক্শা করে ফিরছেন। হাতে বাজারের ব্যাগ। আমি ছুটে গিয়ে বললাম, কেমন আছেন?

তিনি বিস্মিত গলায় বললেন, চিনতে পারছি না তো, কে?

'চিনতে পারছেন না?'

'না। কে তুমি?'

"ওগেনকি দেসু কা?"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, এর মানে?

আমি শান্তগলায় বললাম, এটা জাপানী ভাষা আপনি বুঝবেন না।

ভদ্রলোক রিক্শা থামিয়েছেন। আমি এগিয়ে যাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তেই অপেক্ষা করছি তিনি পেছন থেকে কোমল গলায় ডেকে উঠবেন — "রেনু। এই রেনু।" আর আমি তাঁকে কাঁদতে কাঁদতে বলব, জানেন এই কিছুক্ষণ আগে আমার ভাই মারা গেছে। ওর নাম রঞ্জু। ফানি ম্যান রঞ্জু।

আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। সন্ধ্যা হতে বেশী বাকি নেই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের সমস্ত হলুদ বাতি জ্বলে উঠবে। কুৎসিত নোংরা শহরটাকে মনে হবে সোনালী শহর।